ঐ আকাশ না ডাকলে

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

ঐ আকাশ
না ডাকলে

ঐ আকাশ না ডাকলে

বিমানযাত্রার শুরু থেকে শেষ

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

অগ্রজ
প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে

ভূমিকা

বিমানের ভ্রমণ নতুন প্রযুক্তি নয়। কিন্তু আধুনিকতম সব প্রযুক্তি বিমানভ্রমণের মধ্যে পুঞ্জীভূত হবার প্রবণতাটি রয়েছে সব সময়। কাজেই আমাদের অলক্ষ্যে এর খোল-নলচে নিত্য পালটে যাচ্ছে। সেগুলো অবশ্য বিস্তারিত লক্ষ করার বিষয়। কিন্তু এত ভারী, এত বড় এই জবড়জং জিনিসটা এভাবে আকাশ ফুঁড়ে চলে যাওয়ার মৌলিক বিষয়গুলোও প্রচুর কৌতূহলের উদ্রেক করে। নেহাতই ব্যক্তিগত কৌতূহল মেটাবার তাগিদ থেকে এই বইটির জন্ম। আমার বিশ্বাস এমনি একটি তাগিদ অনেকেই অনুভব করেন। নিজে বিমান-ভ্রমণ করলে তো করেনই, না করলেও করেন।

এ সম্পর্কে যে নানারকম প্রশ্ন ভিড় করে আসে তার অনেকগুলোর উত্তর সহজ বোধগম্য কোনো বইতে পাইনি। হয়তো সেরকম বই আপাতত নেই। কিছু-কিছু জিনিস আশ্চর্যজনকভাবে পেয়ে গেছি বিমানের কট্টর ডিজাইনের বইতে—যেখানে বোয়িং ৭৪৭সহ ছোট-বড় বিমানের বিস্তারিত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন ও হিসাব-নিকাশ বোঝানো হয়েছে শিক্ষার্থীদেরকে। মজার ব্যাপার হল টেলিভিশন যে আজকাল অনেক বিষয়ে জ্ঞান দানে একটি বড় ভূমিকা নিতে পারে সেটি এই প্রসঙ্গে আবিষ্কার করলাম। বিশ্বখ্যাত বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল, বিশেষ করে 'ডিসকভারি' চ্যানেলে বিমান একটি প্রধান উপজীব্য। অনেক প্রশ্ন যার উত্তর সহজে পাচ্ছিলাম না, হঠাৎ-হঠাৎ টেলিভিশনের পর্দায় এমনিভাবে পেয়ে গেছি—বিশেষ করে বিমান ভ্রমণের সাম্প্রতিকতম অগ্রগতিগুলো। এভাবেই তৈরি হয়েছে এ বইটি— 'ঐ আকাশ না ডাকলে'। আমার মনে হয়েছে শিশু-মন থেকে শুরু করে সব মনের মধ্যেই আকাশে ওড়ার প্রতি একটি আলাদা সংবেদনশীলতা রয়েছে। তার সঙ্গে গিয়ে মিশতে পারলে এ বইটি সার্থক হবে।

ঢাকা
আগস্ট, ২০০৩

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

সূচিপত্র

যাত্রার সময় ঘোষণা করছে ১১
নিরাপদ ও আরামদায়ক করার জন্য ১৩
যাত্রার ঠিক আগে ১৫
বিমান যখন ওড়ে ১৭
ডানার চেহারা-বদল ২৪
ইঞ্জিন : সবকিছুর মূলে ২৭
উড়তে-উড়তে হালকা ৩৭
সিটবেল্ট বেঁধে নিন ৩৯
অটোপাইলটের তত্ত্বাবধানে ৪৫
কোন কূল হতে কোন কূলে যাব ৪৭
যখন যন্ত্র-পাঠই ভরসা ৫১
আবহাওয়ার হাওয়া বুঝে চলা ৫৬
নিরাপদ, তবুও প্রস্তুত ৬০
সব পাখি ঘরে ফেরে ৬৬
আগামীতে ৭৪

যাত্রার সময় ঘোষণা করছে

হন্তদন্ত হয়ে অনেক ঝামেলার মধ্য দিয়ে এসেছি। চেক ইন করার জায়গায় লম্বা লাইন ছিল। তার আগে ব্যাগেজ এক্সরেতেও ছিল ভিড়। ঢাউস ভারী সুটকেসটি সামাল দিতে হয়েছি ক্লান্ত। ওরা আবার বলে বসেছিল কাঁধের ব্যাগটি ক্যাবিনে যাবে না, বেশি বড়। অনেক বলে-কয়ে রাজি করিয়েছি। আইল সিট, উইনডো সিট কোনোটাই পাওয়া যায়নি—বসতে হবে দুই দিকে অপরিচিতের মাঝখানে চিড়েচ্যাপটা হয়ে। ইমিগ্রেশন পার হবার পর সিকিউরিটির লোকরা তুলোধুনো করে সবকিছু চেক করেছে। তবুও ভাগ্যিস কোনো-কোনো এয়ারপোর্টের মতো জুতা, বেল্ট এগুলো খোলায়নি। অবশেষে ঘর্মাক্ত দেহে ডিপারচার গেইটের কাছের ওয়েটিংরুমে এসে বসেছি আর অপেক্ষা করছি কখন উচ্চারিত হবে সেই মধুর বাক্যটি—আমার ফ্লাইটটি তার যাত্রাসময় ঘোষণা করছে ইত্যাদি ইত্যাদি। না, যাত্রাসময় ঘোষণা হবে না, ঠিক এখুনি হবে না। কারণ আমার এই যাত্রাটি, অন্য যাত্রাগুলোর চাইতে একটু ভিন্ন হবে।

সবসময় বিমানযাত্রায় মোটামুটি এরকম কর্তব্যই করে গেছি। বিমানে গিয়ে বসে পড়ার পর শুধু খাবার কী আসবে, মুভি কী দেখাবে, এসব ছাড়া কিছুই চিন্তা করিনি। আর গন্তব্যে পৌঁছার পর লাগেজ ট্রান্সফার হল কি না আর রিসিভ করতে কেউ আসবে কি না ঐ ভাবনাই মাথায় রেখেছি। মাঝখানে কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল, কেমন করে এত মানুষ এত বোঝা নিয়ে এই বিশাল বিমান আমাকে অল্প কয়েকটি

ঘণ্টায় নিরাপদে হাজার-হাজার মাইল উড়িয়ে সোজা গন্তব্যে নিয়ে গেল কিছুই টের পেতে না দিয়ে—এমন একটি জটিল ভাবনা মনে কখনো স্থান পায়নি। এই যাত্রায় কিন্তু তার ব্যতিক্রম ঘটাব। যাত্রার প্রত্যেকটি বিষয় বোঝার চেষ্টা করব—খুঁটিনাটি কিছুই বাদ যেতে দেব না। তাই ফ্লাইটের যাত্রাসময় ঘোষণা করে এখনই যাত্রীদেরকে ডাকা যাবে না।

নিরাপদ ও আরামদায়ক করার জন্য

ওয়েটিংরুমের বিশাল কাচের ভেতর দিয়ে এতক্ষণ দেখছিলাম যে-বিমানটি কিছুক্ষণ পর আকাশে আমার শান্তির নীড় হতে যাচ্ছে, তাকে সেই নীড় হবার উপযুক্ত করে তোলার জন্য অনেকেই একে ছেঁকে ধরেছে। কী করছে তখন বুঝিনি, কিন্তু বোঝার চেষ্টা করা যাক।

নিরাপদে ওড়ার উপযুক্ত রাখার জন্য অনেকরকমের চেক করার কাজ বিমানে সবসময় করতে হয়। শেষ মুহূর্তের দেখাশোনাটি এখন উড়াল দেবার ঠিক আগে করা হচ্ছে বটে, কিন্তু বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে আরো বিভিন্নতর পর্যায়ে এ-কাজ হতেই থাকে। প্রতি ষাট ঘণ্টা ওড়ার পরপর একটি 'এ' চেক হতেই হবে। এতে বিমানের চাকা ওঠানামা করানোর ল্যান্ডিং গিয়ার, ল্যান্ডিং-এর বাতি, দরজার খোলা বাঁধা, টায়ারের প্রেশার সবই পরীক্ষা করা হয়। একজন ইঞ্জিনিয়ার ডানা, লেজ আর মূল বডির বাইরে তন্নতন্ন করে দেখেন কোথাও দৃশ্যমান কোনো বৈকল্য চোখে পড়ে কি না। শুধু তা-ই নয়, দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে পাছে প্রয়োজন হতে পারে এমন সব জিনিস—অক্সিজেন মাস্ক, আগুননির্বাপক, জরুরি অবতরণ স্লাইড, জীবনরক্ষাকারী ভেলা এসব ঠিক আছে কি না তাও দেখে নেয়া হয়। সবই করা হয় ঘনঘন 'এ' চেকের মাধ্যমে।

'বি' চেকটি আরো ব্যাপক। এটি প্রতি ৪০০ ঘণ্টা ওড়ার পরপর করা হয়। এটি করতে একটি পুরো রাত লেগে যেতে পারে। এর মাধ্যমে বিমানের প্রত্যেকটি জিনিস, প্রত্যেকটি সিস্টেম—কোমরে বাঁধার সিটবেল্টটি থেকে শুরু করে ইঞ্জিনের প্রত্যেক যন্ত্রাংশ ঠিক আছে কি না, ঠিকভাবে কাজ করছে কি না দেখে ফেলা হয়।

আর বিমানভেদে ১৪,০০০ ঘণ্টা থেকে ২৪,০০০ ঘণ্টা পর্যন্ত ওড়ার পর বিমানকে পুরোপুরি একবার ওভারহল করতে হয়। তখন পুরো বিমানের সব অংশ আলাদা করে খুলে ফেলে আবার জুড়তে হয় প্রায় এক মাস ধরে। আধুনিক বিমান অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একটি যন্ত্র বলেই বহু হাজার ঘণ্টা পর এমন কাজে হাত দিলে চলছে।

দেখা যাক এতসব রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সাধারণত কোথায় মেরামত বা রদবদলের কাজ করতে হয়। ভাগ্য ভালো যে আজকাল অধিকাংশই জেট ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়, দূরপাল্লায় তো বটেই। এতে চলমান অংশ কম বলে ক্ষয়প্রাপ্তির হারও কম। তবে এর মধ্যে উচ্চ উত্তাপ সৃষ্টি হয় মূল জেটপাইপের মধ্যে ২০০০° সে. পর্যন্ত। এর টারবাইনে যে ১৩০ কি তারও বেশি বেশ সূক্ষ্ম কাজ-করা পাখার ব্লেইড থাকে তাকেও কাজ করতে হয় প্রায় ৫০০° সে. উত্তাপে। এজন্য ইঞ্জিনের নানা অংশ এক-এক পর্যায়ে ক্ষয়িত ও নাজুক হয়ে পড়ে এবং তখন তা বদলাবার প্রশ্ন ওঠে। তা ছাড়া বেশি জ্বালানি পুড়ে অদক্ষ হয়ে উঠলেও ইঞ্জিন অংশত বা পুরো বদলাতে হয়—যার অনেক খরচ।

অনেক সময় দুই ফ্লাইটের মাঝখানে জরুরি ভিত্তিতেও ইঞ্জিন বদলাতে হয়। তাই প্রত্যেক কোম্পানি বেশকিছু বাড়তি ইঞ্জিন তার ঘাঁটিতে মজুদ রাখে। ঘাঁটির বাইরে অন্য এয়ারপোর্টে এটি করার জন্য অন্য বিমান কোম্পানির সঙ্গে সমঝোতা থাকতে হয়। ঘণ্টা হিসাবে ইঞ্জিন ভাড়া পাওয়া যায় এ- ধরনের পরিস্থিতিতে।

চাকার টায়ারটির ইতিহাস জানাও জরুরি। প্রত্যেকবার ল্যান্ড করার সময় এদের উপর যে ধকল যায় তার ফলগুলোর রেকর্ড রাখা হয়, ৫০ থেকে ১৫০ বার ল্যান্ডিংয়ের পর এদের বদলানো প্রয়োজন হয়। এও চাট্টিখানি কথা নয়—এক-এক টায়ার লাখ টাকার উপরে ধাক্কা।

বিমানের যন্ত্রপাতির বড় অংশগুলোর মেরামত ব্যয়বহুল তো বটেই, এমনকি বড় বিমানের বাইরের অবয়ব নতুনভাবে রং করতে গেলেও বিশাল খরচের সম্মুখীন হতে হয়। শুধু তা-ই নয়, একটি জাম্বো জেটে এক পরত নতুন রং লাগানো মানে এর ওজন হয়তো প্রায় ৫০০ কিলো বাড়িয়ে দেয়া—সেটিও কম বিবেচ্য নয়।

যাত্রীরা বসে যে-অংশে তাকে বলা হয় বিমানের ক্যাবিন। সেই ক্যাবিনের মেরামত-বদলিও কম লাগে না। বসার সিটকে একটানা ব্যবহারের পর বেশি দিন যেমন ভালো পাওয়া যায় না ; তেমনি আরো অনেক কিছুকেই, যেমন খাবার গরম করার জায়গায় অথবা টয়লেটে। তাই ঘনঘন চেক করে এগুলো ঠিক করে নিতে হয়।

যাত্রার ঠিক আগে

বিভিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ বিমানে নিত্য করতে হয় ঠিকই, কিন্তু দুই ফ্লাইটের মাঝখানে পারতপক্ষে বিমানকে বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখাও চলে না। এয়ারপোর্টে অলস বসে থাকা মানেই হল প্রতি মিনিটে ক্ষতির টাকা গোনা। তাই এক ফ্লাইট থেকে ফিরে অন্য ফ্লাইটে যাত্রা করার মাঝখানটিতে বিমানে কাজ চলে বিদ্যুৎগতিতে। ওয়েটিংরুমে বসে কাচের মধ্য দিয়ে এতক্ষণ ঐ ব্যস্ততাই চোখে পড়ছিল। বিমান ফিরে আসার পরমুহূর্ত থেকে এতে খাদ্য সরবরাহকারী, জ্বালানি সরবরাহকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী ইঞ্জিনিয়ারগণ, ধোয়া-মোছা পরিষ্কার করার লোক সবাই একসঙ্গে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকে আবার নিয়ে এসেছেন নিজ-নিজ অদ্ভুত যানবাহন, সরঞ্জাম, মাল ওঠানামার ক্রেন ইত্যাদি। বিমানে পাওয়ার থাকবে না বলে বিদ্যুৎ সরবরাহের মোবাইল ব্যবস্থাও হাজির হয়েছে এর মধ্যে। পানির গাড়ি এসে বিশুদ্ধ পানি দিয়ে গেছে— জাম্বোতে লাগে আড়াইশো গ্যালন। না-খাওয়া সব খাবার নেমে যাবে, নতুন খাবার উঠবে—যার-যার ওভেন, ফ্রিজ র‍্যাকে সাজানো হয়ে যাবে এদের।

রক্ষণাবেক্ষণ ইঞ্জিনিয়ার টায়ার প্রেশার, চাকা নামানোর আন্ডারক্যারেজ ও হাইড্রলিক সিস্টেম বিশেষভাবে দেখবেন। শেষের দিকে ধোয়া-মোছার কাজও শেষ হবে, টয়লেট থেকে বর্জ্য পাম্প করে শুষে নিয়ে যাওয়া হবে। ক্যাবিনের মধ্যে নতুন করে কভার, ম্যাগাজিন, কম্বল ইত্যাদি দিয়ে দেয়া হবে সিটে-সিটে।

যাত্রার আধঘণ্টাখানেক আগে সেকেন্ড অফিসার এসে জ্বালানি ভরার কাজ তদারকি করবেন—এটি সঠিকভাবে হওয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিমানের বিভিন্ন

ফুয়েল ট্যাংকে সঠিকভাবে বণ্টন করে যথাযথ পরিমাণে জ্বালানি নেয়া চাই—ভারসাম্যের ব্যাপার আছে। জ্বালানি সরবরাহের লাইন স্বচ্ছন্দ থাকা চাই। মাঝারি সাইজের বিমানও ৫০-৭০ টনের মতো জ্বালানি নিতে পারে। এ এক বিশাল ব্যাপার। এ-সময় সেকেন্ড অফিসার বিমানের অন্যান্য জরুরি যান্ত্রিক বিষয়গুলোও ঠিক আছে কি না দেখে নেবেন। যাত্রার মিনিট ১৫-২০ আগে ক্যাপ্টেন ও অন্যান্য ফ্লাইট ক্রু যাঁরা বিমান পরিচালনা করবেন, বিমানে এসে দায়িত্ব নেন। অবশ্য ইতোমধ্যে তাঁরা বিমানের যাত্রা সম্পর্কে ফ্লাইট প্ল্যান পেশ করে এসেছেন, এবং আবহাওয়া ও যাত্রাপথ সম্পর্কে ব্রিফিং নিয়ে এসেছেন।

ক্যাবিনক্রুরা—বিমান-স্টুয়ার্ড, বিমানবালারা এর মধ্যে এসে পড়েছেন—সবকিছু বুঝে নিয়েছেন ক্যাবিনের অর্থাৎ বিমানের যাত্রী-অংশের। এবার সত্যি-সত্যি যাত্রাসময় ঘোষণা করে যাত্রীদেরকে বিমানে ঢোকাবার পালা।

বাইরের সহায়তাকারীরা একে-একে সবাই বিদায় নিচ্ছে। শুধু ইঞ্জিন চালু করার জন্য কমপ্রেস্ড্ এয়ার দিয়ে গেল এর জন্য আসা গাড়ি। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমিও এবার আমার ফ্লাইটের মধ্যে নিমগ্ন হলাম বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে।

বিমান যখন ওড়ে

আমাদের ক্যাপ্টেন ও তাঁর ফ্লাইট ক্রু উড্ডয়নের প্রস্তুতি নিতে-নিতে ভালো করে একবার দেখে নিতে চাই যে-জাহাজটির মধ্যে আমি চড়ে বসেছি সেটি আসলে কী যন্ত্র? কেমন করে সেটি উড়বে? আর পাইলটও-বা কেমন করে সেটি ওড়াবেন? এসব আগেভাগে বুঝে না নিলে ওড়া শুরুর পর বুঝতে পারব না কোনটি কখন হচ্ছে, কেন হচ্ছে।

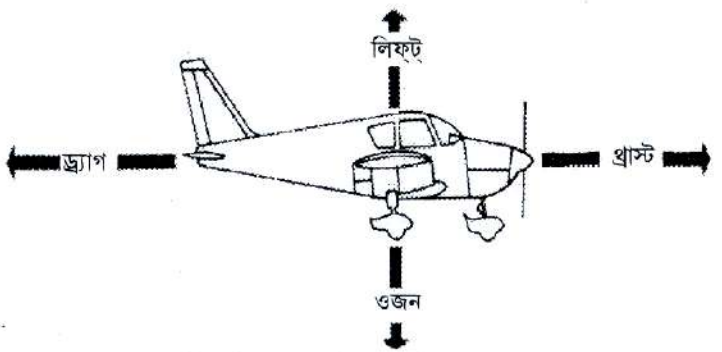

চারটি শক্তি যেগুলো বিমানের উপর সবসময় কাজ করে

এত ভারী হয়েও ওড়ে কেন?

বিমান ওড়ার নীতিটি বুঝতে গেলে মনে রাখতে হবে চারটি শক্তি ওড়ার সময় নিত্য তার উপর কাজ করছে। এর মধ্যে ওজন আর ড্র্যাগ (বাতাসের বাধা) চাইছে বিমানকে

থামিয়ে নিচে ফেলে দিতে, আর লিফ্‌ট্ (ভাসিয়ে রাখা) আর থ্রাস্ট (সামনে এগুনো) চাইছে ঐ ফেলে দেয়ার শক্তিকে অতিক্রম করতে। স্পষ্টতই বিমান বহু টন ওজনের একটি জবড়জং জিনিস—প্রতি মুহূর্ত তাকে চেষ্টা করেই ভেসে থাকতে হয় বাতাসে, সে-চেষ্টা না থাকলে এটি পড়ে যাবে নিজ ওজনেই। ওজনের স্বাভাবিক প্রবণতা অতিক্রম করে এটি ভেসে থাকে লিফ্‌টের কারণে। ঐ লিফ্‌ট্ আবার সৃষ্টি হয় বিমানের ডানার উপর-নিচ দিয়ে দ্রুতবেগে যে-বাতাস প্রবাহিত হয় তার কারণে। ডানার গঠনটাই এমন যে দ্রুতগতি বাতাস এর উপর ঊর্ধ্বচাপ সৃষ্টি করে একে ভাসিয়ে রাখে। ডানার উপরের তলাটি থাকে কিছুটা কুঁজের মতো বাঁকানো, আর নিচের তলাটি থাকে চ্যাপটা সমতল। সজোরে প্রবাহিত বাতাসকে তাই উপরের তলে কিছুটা ঘুরে যেতে হয়। আর নিচের তলে যায় সোজা সরাসরি। এর ফলে উপরের বাতাস অপেক্ষাকৃত দ্রুততর হয় একই সময়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে বলে। পদার্থবিদ্যার বার্নোলির নিয়ম অনুযায়ী দ্রুততর বাতাসের চাপ কম হয়। ডানার উপরের বাতাসের চাপ এজন্য নিচের বাতাসের চাপের চেয়ে কম হয়। নিচের অধিকতর চাপ তাই ডানাকে উপরের দিকে ঠেলে ধরে—এটিই লিফ্‌ট্। লিফ্‌টের জন্য প্রয়োজনীয় বাতাসের দ্রুতগতি সৃষ্টি হয় বিমান এর ভেতর দিয়ে সজোরে এগিয়ে যায় বলে। সজোরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব অবশ্য ইঞ্জিনের। ড্র্যাগ হল এগিয়ে যাওয়ার পথে বাতাসের ঘর্ষণের বাধা, কাজেই এটিও ভেসে থাকার বিরুদ্ধে কাজ করে। ড্র্যাগ কমাবার জন্য বিমানকে যথাসম্ভব সরু বুলেট আকৃতির ও মসৃণ করতে হয় যাতে করে অতিরিক্ত বাতাসের বাধা না পেয়েই সে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যেতে পারে—একে বলে আকৃতিটাকে স্ট্রিমলাইনিং করা।

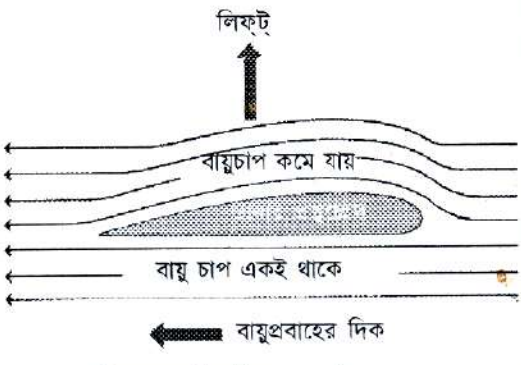

ডানার বিশেষ আকৃতির কারণে গতিতে থাকার সময় লিফ্‌ট্ সৃষ্টি

যতক্ষণ বিমানের থ্রাস্ট এত অধিক যে তার দ্বারা সৃষ্ট লিফ্‌ট্ বিমানের ওজন আর ড্র্যাগের বাধাকে অতিক্রম করে আরো কিছু বাড়তি থাকছে শুধু তখনই বিমান উপরে উঠতে পারে, উড়তে পারে। কাজেই বিমানের ওড়া হল ওজন আর ড্র্যাগের বিরুদ্ধে

তার থ্রাস্ট আর লিফ্‌টের একটি সার্বক্ষণিক লড়াই। ড্র্যাগ অতিক্রম করে থ্রাস্ট যত বেশি হবে, অর্থাৎ যত জোরে বিমান এগোয় তার উপরে ওঠার ও উপরে থাকার ক্ষমতা তত বাড়ে।

ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভারসাম্যহীনতা

বিমানের জন্য সম্পূর্ণ ভারসাম্য থাকার অর্থ হল একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় একেবারে সমতলে (লেভেলে) থেকে সোজা উড়ে যাওয়া। অনেকখানি সময় এভাবে ভারসাম্যে থাকলেও সবসময় তা থাকা সম্ভব নয়। বিমানকে পাইলট ইচ্ছামতো চালনা করেন তার মধ্যে সাময়িকভাবে ভারসাম্যহীনতা এনে। অনুরূপভাবে আবহাওয়া ইত্যাদি কারণে অনিচ্ছাকৃত ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হলে তিনি তার মোকাবেলা করেন উলটো ধরনের অন্য ভারসাম্যহীনতা এনেই। দেখা যাক উড়ন্ত অবস্থায় বিমানে কী কী ভারসাম্যহীনতা আসতে পারে।

এদের সংখ্যা তিনটি এবং এই তিনটিকেই বিমান চালনা করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। বিমানের নাক ডানে-বাঁয়ে ঘুরতে পারে—একে বলা হয় 'ইয়'। ইয় হওয়াটা প্রতিরোধ করে বিমানের লেজে খাড়া হয়ে থাকা রাডার যা নৌকার হালের মতোই কাজ করে। অবাঞ্ছিত ইয় সৃষ্টি হলে রাডার ডানে-বামে করে যেমন বিমানের নাক সোজা রাখা যায়, তেমনি গতির দিক-পরিবর্তন করতে চাইলে পাইলট ইচ্ছা করে রাডার ঘুরিয়ে তা করতে পারেন। রাডারকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন পায়ের মাধ্যমে রাডার প্যাডেলে চাপ দিয়ে।

রাডার নিয়ন্ত্রণ করে ডানে-বামে 'ইয়'

বিমানের নাক উপর-নিচ করাটাকে বলা হয় 'পিচ'। এটি নিয়ন্ত্রণ করা হয় লেজের কাছে ছোট যে সমতল ডানা থাকে তার অংশবিশেষ দিয়ে বা পুরোটা দিয়েই—যাকে বলা হয় ইলেভেটর। একে কবজার মাধ্যমে কপাটের মতো খানিকটা কোণ করে তুলে ধরে বা নিচে নামিয়ে তার উপর চলমান বাতাসের চাপে বিমানের নাক উঁচু-নিচু করা যায়। এটি পাইলট করেন তাঁর সামনে কন্ট্রোল কলাম বা 'স্টিক' সামনে ঠেলে

(এলিভেটর নামবে, লেজ উঁচু ও নাক নিচু হবে) বা কাছে টেনে এনে (এলিভেটর উঠবে, লেজ নিচু ও নাক উঁচু হবে)।

এলিভেটর নিয়ন্ত্রণ করে উপর-নিচ 'পিচ'

বিমান যখন ডানে-বামে কাত হতে থাকে সেই ভারসাম্যহীনতাকে বলা হয় 'রোল'। একদিকের ডানা অন্যদিকের ডানার থেকে উঁচু বা নিচু হতে থাকলে বলা হয় বিমান রোল করছে। সহজে অবাঞ্ছিত রোল না হবার জন্য বিমানের ডানাগুলো তার ফিউজল্যাজ (মূল দেহ) থেকে সামান্য একটু ঊর্ধ্বমুখি হয়ে দুপাশে বিস্তৃত হয়, এরা উভয়ে ঠিক এক সমতলে থাকে না। দুই ডানাতেই কবজায় আটকানো কপাটের মতো উঁচু-নিচু করার দুটি এইলরন থাকে। এক ডানায় একে উপরে তোলা হলে একই সঙ্গে অন্য ডানায় তা নিচে নামে—ফলে বাতাস লেগে যেদিকেরটি উঁচু হয়ে আছে বিমান সেদিকে কাত হয়ে পড়ে। পাইলট স্টিক ডান-বাম করে বিমানকে এভাবে

এইলরন নিয়ন্ত্রণ করে ডানে-বামে কাত হওয়া বা 'রোল'

প্রয়োজনমতো রোল করিয়ে লেভেলে আনতে পারেন। আবার একইভাবে ইচ্ছে করেও কাত করতে পারেন—ঘোরার সময় সেটি দরকার হয়। যে-কারণে বাঁক ঘোরার সময় সাইকেলকে কাত করতে হয় সেই একই কারণে বিমানকেও কাত করতে হয়—তখন বলা হয় বিমান সেদিকে 'ব্যাংক' করেছে।

রাডার, এলিভেটর ও এইলরন এই তিনটির সাহায্যে যথাক্রমে ইয়, পিচ ও রোল নিয়ন্ত্রণ করে বিমানের ভারসাম্যের উপর দখল প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়াও পাইলটের কাছে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে তা হল ইঞ্জিনের পাওয়ার বাড়ানো-কমানো। এটি তিনি করেন 'থ্রটলের' সাহায্যে যা ইঞ্জিনে বেশি বা কম জ্বালানি পাঠিয়ে তার পাওয়ার বাড়ায় বা কমায়। পাইলট এজন্য থ্রটলকে সামনে ঠেলেন বা পেছনে টেনে আনেন। ইঞ্জিনের পাওয়ার বাড়িয়ে লিফ্‌ট্ বাড়ানো যায়, নিচু-হয়ে-যাওয়া নাককে উঁচু করে তোলা যায়। তেমনি পাওয়ার কমিয়ে বিপরীতটিও করা যায়।

ডানার প্রস্থরেখা অর্থাৎ অগ্রবর্তী কিনারা ও পশ্চাৎ কিনারার সংযোগকারী সরলরেখাটি বিমানের চলার পথের সঙ্গে অর্থাৎ বাতাসের প্রবাহের সঙ্গে যে-কোণ করে তাকে বলা হয় বাতাস কাটার কোণ (অ্যাঙ্গল অব আট্যাক)। এলিভেটর উপরে তুলে বিমানের নাক কিছু উঁচু করলে অথচ নাকবরাবর ঊর্ধ্বমুখি যাবার জন্য উপযুক্ত থ্রাস্টের অভাবে গতি এখনো ভূ-সমান্তরাল থাকলে, ডানার এই বাতাস কাটার কোণটি বড় হয়, এবং সে-অবস্থায় লিফ্‌ট্ বাড়ে। আমরা দেখেছি বিমানের ডানায় লিফ্‌টের সৃষ্টিই হয় এর উপর-দিয়ে-যাওয়া বাতাসকে কিছুটা ঘুরে যেতে হয় বলে। সাধারণত ডানার গঠনেই উপরের তলটি খানিকটা বক্রাকার ও নিচের তলটি সোজা করে এই লিফ্‌টের ব্যবস্থাটি করে দেয়া হয়। এর উপর ডানার বাতাস কাটার কোণ বাড়লে উপর-দিয়ে-যাওয়া বাতাসের গতিপথ আরো বক্রাকার হয়—লিফ্‌ট্ আরো বাড়ে।

কিন্তু এভাবে নাক উঁচু করে লিফ্‌ট্ বাড়াবার জন্য একটি মূল্যও দিতে হয়। এর ফলে বাতাসের বাধা অর্থাৎ ড্র্যাগও বাড়ে। গতি বজায় রাখার জন্য এ-অবস্থায় তাই ইঞ্জিনের পাওয়ারও বাড়াতে হয়—তবেই বাড়তি লিফ্‌টের সুবিধাটি ভোগ করা যাবে। বিমান যদি ভূমি-সমান্তরালে সোজা এগুতে চায় এবং তার গতিবেগ খুব বেশি থাকে তা হলে এ-গতিই তাকে নিজ উচ্চতা বজায় রেখে লেভেল ফ্লাইটে চলার মতো লিফ্‌ট্ যোগাবে। বাতাস কাটার কোণ বাড়িয়ে বাড়তি লিফ্‌ট্ পাওয়ার চেষ্টার এবং সেই সুবাদে বাড়তি ড্র্যাগ ডেকে আনার কোনো প্রয়োজন তার তখন থাকে না। কিন্তু যদি মাঝারিরকমের গতিতে সে ভূমি-সমান্তরালে এগুতে চায়, তখন হয়তো তাকে বাতাস কাটার কোণ একটু বাড়াতে হবে লিফ্‌ট্ বজায় রাখার জন্য অর্থাৎ নাক একটুখানি উঁচু রেখে চলতে হবে একই উচ্চতায় থেকে সোজা চলার জন্যও। আর যদি খুব কম বেগে এটি ভূমি-সমান্তরালে চলতে চায় উচ্চতা বজায় রেখে তা হলে তার বাতাস কাটার কোণ যথেষ্ট বাড়াতে হবে নাক আরো উঁচু রেখে। এ-অবস্থায় যে প্রচুর ড্র্যাগ উৎপন্ন হবে তাকে ঠেকাবার জন্য ঐ অল্পগতির অবস্থায়ও ইঞ্জিনের যথেষ্ট পাওয়ার প্রয়োগ করতে হবে। টেইকঅফের মুহূর্তে ও ল্যান্ডিংয়ের সময় এরকম পরিস্থিতি থাকে বলে এগুতে হয় নাক উঁচু করে। অবশ্য প্রথম ক্ষেত্রে পরপরই অরোহণে যেতে

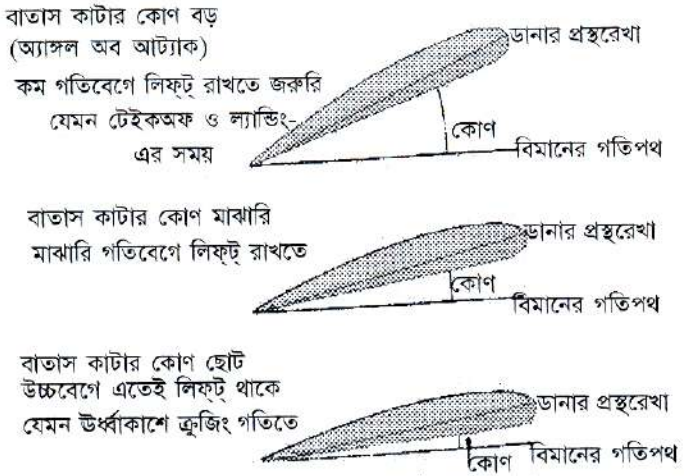

গতিপথের সঙ্গে ডানার প্রস্থরেখার কোণ অর্থাৎ বাতাস কাটার কোণের হ্রাস-বৃদ্ধি করে প্রয়োজনীয় লিফ্‌ট্ বজায় রাখা

হবে বলে সর্বোচ্চ পাওয়ার প্রয়োগ করতে হয়, আর শেষের ক্ষেত্রে নেমে থামতে চাই বলে ড্র্যাগকে বরণ করে নিয়ে পাওয়ার কম রাখলে চলে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভেসে থাকার জন্য যতটুকু লাগে ততটুকুতে।

পাইলটকে একাধিক বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ তাই একই সঙ্গে প্রয়োগ করতে হয় বিমানকে নানাভাবে চালনার প্রয়োজনে। যেমন ধরা যাক তিনি বামে ঘুরতে চান। তা হলে বাম প্যাডেলে চাপ দিয়ে রাডারকে বামে ঘোরাবেন বাম 'ইয়' সৃষ্টির জন্য। কিন্তু একই সঙ্গে বাম দিকে কাত হয়ে 'রোল' করতেও হবে বলে স্টিককে বামে সরাবেন। এভাবে বিমান বামে ঘুরতে গিয়ে কিন্তু লিফ্‌ট্ কিছুটা হারিয়ে ফেলবে। এই লিফ্‌ট্ বজায় রাখার জন্য পাইলট একই সঙ্গে বাতাস কাটার কোণ বাড়িয়ে নেবেন এলিভেটর উঁচু করে অর্থাৎ স্টিককে কিছুটা টেনে এনে। এভাবে কোণ বাড়াতে ড্র্যাগ বাড়বে, সেটি পুষিয়ে দিতে থ্রটল একটু ঠেলে দিয়ে ইঞ্জিনের পাওয়ার বাড়াবেন। এই এতগুলো কাজ প্রায় একই সঙ্গে করতে হবে শুধু বিমানকে বামে ঘোরাতে। এভাবে বিমানের গতিভঙ্গি পরিবর্তনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণের একযোগে প্রয়োগ করতে হয় নানা দিকে খেয়াল করে।

এইসব নিয়ন্ত্রণ পাইলটের কাছে আরো বেশি জরুরি হয়ে ওঠে, বিমান যখন হঠাৎ 'স্টল' করে। স্টল করার মানে হল লিফ্‌ট্ হারিয়ে উচ্চতা হারানো। কোনো

কারণে বিমানের গতি হঠাৎ কমে গিয়ে লিফ্‌ট্‌ হারালে এটি হতে পারে। তা ছাড়া বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে বাতাস ডানার উপর দিয়ে মসৃণভাবে প্রবাহিত হয়ে লিফ্‌ট্‌ সৃষ্টির বদলে তার গতিপথ ভেঙে গিয়ে ডানার কাছে একটি এলোমেলো অবস্থার সৃষ্টি করে। এর ফলে লিফ্‌ট্‌ হঠাৎ কমে গিয়ে বিমান দ্রুত উচ্চতা হারাতে থাকে। ঝোড়ো বাতাসে এটি হতে পারে। গতিদিকের সঙ্গে বিমানের নাক একটি সীমার থেকে বেশি উঁচু হয়ে থাকলেও এটি হতে পারে। সেক্ষেত্রে ডানার বাতাস কাটার কোণ (অ্যাঙ্গল অব আট্যাক) সীমাতিরিক্ত হয় বলে তার উপর প্রবাহিত বাতাসের মসৃণতা ভেঙে যায়। ফলে নাটকীয়ভাবে লিফ্‌ট্‌ হ্রাস পায়। সাধারণত ইঞ্জিনের পাওয়ার বাড়িয়ে বা নাক একটু নিচু করে গতি বাড়িয়ে স্টল থামানো যায়। কিছু জেটবিমানে থামানোর কাজটি সহজ হয় না, এলিভেটরের কাছে বাতাস সুশৃঙ্খলভাবে এ-সময় পৌঁছে না বলে এ-অবস্থায় তা দিয়ে সাধারণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা কঠিন হয়। এজন্য স্টল শুরু হবার আগেই যেন তা বোঝা যায় এবং দমন করা যায় সে- ব্যবস্থাই আজকাল রয়েছে।

ডানার চেহারা-বদল

ভূমি ছেড়ে উড়াল দেয়া হল টেইকঅফ করা, আর ভূমিতে নেমে আসা হল ল্যান্ডিং। এই উভয় সময় আমাদের বড় জেটবিমানগুলোকে তাদের ডানার আকার, আকৃতি, চেহারা খানিকটা বদলে নিতে হয়।

এটি করার কারণ হল এই বিমানের ডানা ডিজাইন করা হয়েছে মূলত অনেক উচ্চতায় অতিউচ্চ বেগে চলার উপযুক্ত করে। এজন্য তাদেরকে পাতলা ও মসৃণ হতে হয়, যাতে বেশি ড্র্যাগ না হতে পারে। কিন্তু এই একই চেহারা যদি তার ল্যান্ডিং ও টেইকঅফের সময়ও বজায় থাকে তা হলে চলে না। নিরাপদে টেইকঅফ ও ল্যান্ডিং করার জন্য বিমানের গতি অনেকটা কম থাকতে হয়। ঐ দু'সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় একেবারে নিম্নগতিতে ঐ ডানা প্রয়োজনীয় লিফ্‌ট্ উৎপন্ন করতে পারে না, তাই ভেসেও থাকতে পারে না। এজন্য নিম্নগতিতে লিফ্‌ট্ তৈরির উপযুক্ত করে ডানার আকৃতি তখন বদলে নিতে হয়। খেয়াল করলে ঐ সময়টায় দেখা যায় যে ডানার বিভিন্ন দিকে নূতন কিছু সম্প্রসারণ ইত্যাদি ঘটছে। প্রয়োজন ফুরালে এগুলোকে আবার গুটিয়ে রাখা হয়। অথবা দেখা যায় ডানার কিনারায় একটি অংশ নিচের দিকে বাঁকিয়ে দেয়া হয়েছে।

ফ্ল্যাপ

ডানার আগে-পিছে কিছু অংশ নিচের দিকে বাঁকা হয়ে আসা অথবা সম্প্রসারিত হয়ে বের হয়ে আসা ও নিচের দিকে বাঁকা হওয়া—এগুলো লিফ্‌ট্ বাড়াবার ব্যবস্থার অন্তর্গত। এগুলোকে বলা হয় ফ্ল্যাপ। কিছু ফ্ল্যাপ ডানার পেছনের দিকে সম্প্রসারিত হয় এবং নিচের দিকে বেঁকে কিছুটা খাড়া হয়ে থাকে। ডানার প্রশস্ততা বাড়িয়ে এরা

ডানার লিফ্‌ট্ উৎপাদনক্ষমতা বাড়ায়। তা ছাড়া সম্প্রসারিত হোক বা না- হোক নিচের দিকে গিয়ে এরা ডানার উর্ধ্বতলের অধিক বক্রতা সৃষ্টি করে বিমানকে বাড়তি লিফ্‌ট্ দেয়। এর ফলে অনেক কম গতিতেও বিমান তখন ভাসতে পারে। ল্যান্ডিং-এর সময় গতি একেবারেই কমিয়ে ফেলতে হয় বলে ফ্ল্যাপ পুরোমাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। টেইকঅফের সময় এতটা প্রয়োজন হয় না, বরং ড্র্যাগ সীমিত রাখার জন্য ফ্ল্যাপ সীমিত পরিমাণে প্রয়োগ করা হয়।

পেছনের ফ্ল্যাপের মতো কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সামনের দিকেও নিম্নগামী ফ্ল্যাপ সম্প্রসারিত করে লিফ্‌ট্ বাড়িয়ে গতি আরো কমাবার সুযোগ করে দেয়া হয়। পেছনের ফ্ল্যাপের প্রবণতা থাকে এখন বিমানের আরো পেছনে বাড়তি লিফ্‌ট্ সৃষ্টি করে নাক কিছুটা নিম্নাভিমুখি করার। সামনের ফ্ল্যাপ আরো সম্মুখভাগে লিফ্‌ট্ সৃষ্টি করে এই প্রবণতা রোধ করে।

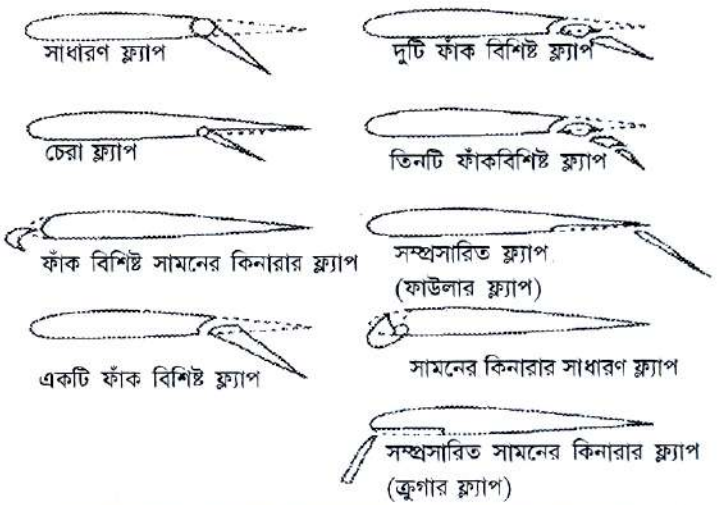

বিভিন্ন বিমানে ব্যবহৃত বিচিত্র ধরনের ফ্ল্যাপ, যা নানাভাবে লিফ্‌ট বাড়াতে সাহায্য করে

স্পয়লার

জেটবিমান এমন স্ট্রিমলাইন করে তৈরি যে ইঞ্জিনের পাওয়ার কমালেও এর গতি দ্রুত কমে যায় না, এজন্য বাধা সৃষ্টি করে গতি কমানো দরকার হয়। তা ছাড়া ইঞ্জিনের পাওয়ার শেষমুহূর্ত পর্যন্ত একেবারে শূন্যও করে ফেলা যায় না, কারণ ঠিক ভূমিতে নামার আগে বিমানকে নাক উঁচু করে ভূমি-সমান্তরাল করতেও বেশ খানিকটা পাওয়ার রেখে দিতে হয়। যথেষ্ট উপরে যে গতিতে থাকার সময় শুরুতে এই বাধা দরকার হয়

তখন ফ্ল্যাপও প্রয়োগ করা যায় না, কারণ ঐরকম বেশি গতিতে ফ্ল্যাপ ডানাকে ছিঁড়ে ফেলতে চাইবে বাতাস ধরে। তাই তখন ডানার উপরতলের উপরেই একটু-একটু উপরে জেগে-ওঠা কিছু প্যানেল বাতাস ধরে এই বাধাসৃষ্টির কাজটি করে। এগুলোকে বলা হয় স্পয়লার। গতি কমিয়ে ফেলা ছাড়া এরা লিফ্‌ট্‌ও কমায়, এবং সেভাবে বিমানকে উচ্চতা হারাতে সাহায্য করে। পরে অবশ্য গতি বেশি কমে গেলে তখন ফ্ল্যাপ বের করে প্রয়োজনীয় লিফ্‌ট্‌ বজায় রাখা হয়। গতি ঘণ্টায় ২৫০ মাইলের নিচে আসার পরই শুধু ফ্ল্যাপ প্রয়োগ নিরাপদ হয়।

ল্যান্ডিং ও টেইকঅফে বিমানের আরো একটি জিনিস থাকে যা অন্য সময় থাকে না। তা হল এর আন্ডারক্যারেজ অর্থাৎ চাকা ও চাকাসংলগ্ন অন্যান্য অংশ। টেইকঅফের পরপরই এগুলো বিমানের পেটের মধ্যে গুটিয়ে ফেলা হয় ড্র্যাগ কমানোর স্বার্থে, নইলে এখানে বাতাস ধরে গতি কমে যেত। তাকে আবার শুধু ল্যান্ডিং-এর খানিক আগে নামানো হয়।

বিমান যেখানে তার চেহারা নেয়

ডানার চেহারা বদলের কথা বলতে গিয়ে পুরো বিমানটিরই নিজের রূপটি ধারণ করার কথা মনে পড়ল। বড়-বড় বিমান শেষ পর্যন্ত বিমান রূপে যেখান থেকে বেরিয়ে আসে সেখানে তৈরি হওয়ার চেয়ে সংযোজনটিই বেশি হয়। এর অংশগুলো তৈরি হয় হয়তো অনেক দূরের অন্য কোথাও—প্রায়শই ভিন্ন নানা দেশের নানা কারখানাতে। বহু আগে থেকে তৈরি করে রাখা পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক সময়ে সব অংশ জড়ো হয় এই সংযোজন-কারখানাতে। কোথাও থেকে আসে ডানা, কোথাও থেকে লেজ, ল্যাণ্ডিং গিয়ার, কোথাও থেকে ফিউজলাজ অথবা ইঞ্জিন—আর ভেতরের অন্য সব জিনিস তো বটেই। বৃহত্তম যাত্রীবাহী বিমানগুলো যেখানে সংযোজিত হয় সেই কারখানা ঘরগুলোও আকারে-বহরে পৃথিবীর বৃহত্তম একক দালানসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অনেকগুলো শক্তিশালী ক্রেন সব অংশ সঠিক পজিশনে নিয়ে গিয়ে খাড়া করে। তারপর শত-শত কুশলী কারিগর সেগুলোকে নিখুঁতভাবে সংযোজিত করেন, বিন্যস্ত করেন অসংখ্য জবড়জং সংযোগব্যবস্থা—সবই বিস্তারিত পূর্ব-নির্ধারিত ডিজাইন অনুযায়ী। কোথাও একটু চুলচেরা গোলমাল হবারও যো নেই। সেজন্য অত্যন্ত শক্তিশালী টেস্টিং ব্যবস্থা পদে-পদে প্রয়োগ করা হয় প্রত্যেকটি পর্যায়ে। তারপরেও বোয়িং বা এয়ার বাসের মতো ব্যস্ত কোম্পানিগুলোর কারখানায়, কয়েক দিন পরে-পরেই সম্পূর্ণ সাজে ওড়ার জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসে এক-একটি বিশালকায় বিমান।

ইঞ্জিন : সবকিছুর মূলে

বিমান ওড়ার পেছনে আসল অবদান ইঞ্জিনের। তারই সৃষ্টি থ্রাস্ট বিমানে লিফ্‌ট্ তৈরি করার সঙ্গে-সঙ্গে একে সামনের দিকেও নিয়ে যায়। বেলুন, এয়ারশিপ ইত্যাদির সঙ্গে বিমানের বড় পার্থক্যই হল এটি বাতাসের চেয়ে অনেক ভারী হয়েও উড়তে পারে। আর তা সম্ভব হয় একমাত্র তার ইঞ্জিনের কারণেই। কাজেই ওড়ার প্রতিটি মুহূর্ত ইঞ্জিন চালু থাকা চাই।

পিস্টন ইঞ্জিন ও প্রপেলার

এর উদ্ভাবনের দিন থেকে শুরু করে জেট ইঞ্জিনের আগমন পর্যন্ত সব বিমান চালিত হয়েছে প্রপেলারের ঘূর্ণনের মাধ্যমে। প্রপেলারের প্রত্যেকটি ব্লেড আকৃতির দিক থেকে বিমানের ডানার মতোই। এর কাজটিও বিমানের লিফ্‌ট্‌সৃষ্টির মতোই, তবে এক্ষেত্রে লিফ্‌টের মতো উপরের দিকে ঠেলে না তুলে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়—এইই তফাত। এর বাইরের তল বক্র কুঁজের আকারের আর ভেতরের দিকের তলটি সোজা সমতল। প্রপেলার ঘোরার সময় এর উভয় তলের উপর দিয়ে বাতাস দ্রুত প্রবাহিত হয়। এ-সময় বক্র তলের উপর বাতাস ঘুরে যায় বলে ওখানে বায়ুচাপ ভেতরের দিকের চেয়ে কম থাকে। কাজেই ভেতরের দিকের বাতাস প্রপেলারকে ঠেলে সামনের দিকে নিয়ে যায় এবং বিমানে থ্রাস্ট বা বেগ সৃষ্টি করে। যত দ্রুত প্রপেলার ঘুরবে, থ্রাস্ট হবে তত বেশি। এখনো এই জেট ইঞ্জিনের যুগেও প্রপেলারচালিত বিমানকে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারে এবং নিকটপাল্লার কাজে সুবিধাজনক মনে করা হয়।

প্রপেলার ঘূর্ণনের জন্য যে-ইঞ্জিন তা পিস্টনসম্বলিত অন্তর্দহন ইঞ্জিন—মোটর-গাড়ির ইঞ্জিনেরই সমগোত্রীয়। তবে আধুনিক প্রপেলারচালিত যাত্রীবাহী বিমানের যে-ইঞ্জিন তা সর্বশ্রেষ্ঠ বা সবচেয়ে শক্তিশালী গাড়ির ইঞ্জিনের চাইতেও উন্নত মানের। ২৪টি পর্যন্ত সিলিন্ডার এতে থাকতে পারে এবং জটিল সমন্বয়ের মাধ্যমে যে ক্র্যাংক শ্যাফটকে এরা ঘোরায় সেটিও অত্যন্ত সূক্ষ্ম মেশিনিং-এর সৃষ্টি। বিভিন্ন উচ্চতায় ওড়ার সময় বায়ুচাপের পরিবর্তনের ফলে জ্বালানিপ্রবাহে যে পার্থক্য হয় তাও শুধরে নেবার ব্যবস্থা এতে থাকে।

প্রপেলার যে-পদ্ধতিতে থ্রাস্ট সৃষ্টি করে তাতে তার ব্লেডের তলগুলো বাতাসের গতিপথে সম্পূর্ণ পেতে দেয়া থাকলেই চলত, কিন্তু তাতে আবার বাতাসের বাধাটিকেও তাকে পুরোপুরি নিতে হয় এবং ড্র্যাগ সৃষ্টি হয়। এজন্য প্রপেলারকে প্যাঁচ খাইয়ে দেয়া হয় যাতে ব্লেড কমবেশি কোনাকুনি বাতাসের সম্মুখীন হয়। এই প্যাঁচ খাওয়ানোর পরিমাণকে বলে প্রপেলারের পিচ।

টেইকঅফ ও ল্যান্ডিং-এর সময় বিমানের গতি যখন কম থাকে তখন অধিক লিফ্টের জন্য প্রপেলার যত বেশি বাতাস ডানার উপর দিয়ে পেছনে ঠেলে দিতে পারবে ততই লিফ্ট পাওয়ার জন্য ভালো। এটি দক্ষভাবে করার জন্য প্রপেলারের

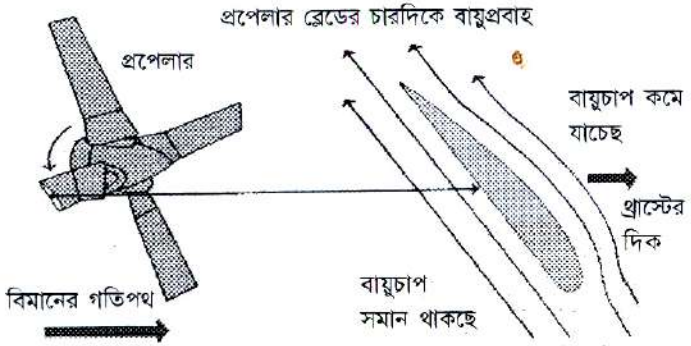

প্রপেলার যে ভাবে থ্রাষ্ট সৃষ্টি করে

ব্লেডগুলো যত কম প্যাঁচ খাওয়ানো থাকবে তত ভালো। একে বলা হয় সূক্ষ্ম পিচের অবস্থা। গতি কম বলে ওভাবে ব্লেডের তলটি বাতাসে প্রায় পুরোপুরি পেতে দেয়া থাকলেও তার জন্য বাধা খুব বেশি হবে না। কিন্তু উচ্চগতিতে চলার সময় এমনটি

থাকবে না। তখন প্রপেলারের কাজে বাতাসের বাধা অনেক বেড়ে যাবে তাই ব্লেডগুলোর প্যাঁচ খাওয়ানো বাড়িয়ে অর্থাৎ এর পিচ বাড়িয়ে এ-বাধা কমাতে হয়। আসলে প্রপেলারের ঘূর্ণনগতি, এর উপর প্রবাহিত বাতাসের গতি এই দুইয়ের যোগ-বিয়োগে প্রপেলার-ব্লেডের কিনারা তার সঙ্গে যেই কোণ করবে সেই বাতাস কাটার কোণ প্রপেলারের কার্যক্ষমতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিমানের ডানার বাতাস কাটার কোণ (অ্যাঙ্গল অব আট্যাক)। তাই সর্বোচ্চ কার্যক্ষমতার জন্য অথবা একই গতি বজায় রাখার জন্য আধুনিক বিমানের প্রপেলারে বিভিন্ন উচ্চতায় এর ঘূর্ণনগতি ও বায়ুগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পিচ বাড়ানো-কমানোর ব্যবস্থা থাকে। ধরা যাক উড়ন্ত অবস্থায় একটি ইঞ্জিন খারাপই হয়ে গেল। তখন প্রপেলারের ব্লেডগুলো মুচড়িয়ে এমন চরম পিচে নিয়ে যেতে হবে যাতে ব্লেডের কিনারাই শুধু বাতাসের গতিপথে থাকে। এটি না করলে শক্তিবিহীন প্রপেলার ফুরফুরির মতো বাতাসে ঘুরতে থাকবে। সেক্ষেত্রে বিমানের অগ্রগতিতে এটি বরং একটি বাধা হয়ে দাঁড়াবে, বিমানকে গতিপথ থেকেও সরিয়ে দিতে থাকবে।

প্রপেলারের পিচের নিয়ন্ত্রণ কিন্তু এতেই সীমাবদ্ধ নয়। সূক্ষ্ম পিচের অবস্থা থেকে ভিন্ন দিকে পুরো মুচড়িয়ে এর সামনের তল পিছনে আর পিছনের তল সামনে নিয়ে যাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে থ্রাস্টের দিকটাও ঘুরে যাবে, উলটো ঠেলার 'রিভার্স থ্রাস্ট' দেখা দেবে। অর্থাৎ এটি তখন বিমানকে পেছনের দিকে নেবার চেষ্টা করে ব্রেকের কাজ করবে। ল্যান্ডিং-এর বিমানকে দ্রুত থামাতে এভাবে এটি সাহায্য করে।

অপেক্ষাকৃত স্বল্প গতিবেগের ক্ষেত্রে পিস্টন ইঞ্জিন বেশ দক্ষ। এর সর্বোচ্চ দক্ষতা আসে ঘণ্টায় ৩০০ মাইলের কিছু নিচের বেগে। বেগ এর থেকে বাড়লে দক্ষতা কমতে থাকে, আর ঘণ্টায় ৪০০ মাইলের উপরে গিয়ে এর দক্ষতা একেবারেই কমে যায়। এ-কারণে শুধু স্বল্প দূরত্বে ভ্রমণের জন্যই এখনো এরকম বিমান ব্যবহৃত হচ্ছে। বেশি বেগে প্রপেলারের দক্ষতা কমে যাওয়ার কারণ হল, তখন যে-ধরনের ঘূর্ণনগতি এর প্রয়োজন তাতে এর কিনারার স্থানীয় গতি শব্দের গতিকেও ছাড়িয়ে যায়—যার ফলে এর উপর ড্র্যাগ বেড়ে যায় প্রচণ্ড। ঐ ড্র্যাগ আবার ইঞ্জিনের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাকে দমিয়ে দেয়। তা ছাড়া খুব বড় ও ভারী বিমানের জন্যও পিস্টন ইঞ্জিন সুবিধাজনক নয়। এর জন্য ইঞ্জিনের অধিক পাওয়ার প্রয়োজন। অধিক পাওয়ার পেতে হলে সিলিন্ডারের সংখ্যা ও সেইসঙ্গে জটিলতা বাড়ানো ছাড়া উপায় নেই। একই ফল পাওয়া যেত সিলিন্ডারের আকার বাড়িয়ে—ঠাণ্ডা করার জটিলতার জন্য সেটি সম্ভব নয়। ওদিকে সিলিন্ডারের সংখ্যা বাড়া মানে লুব্রিকেন্ট ও শীতলকারক তেলের (ইঞ্জিন অয়েলের) পরিমাণ বাড়া। এরকম ইঞ্জিনের চালকদের অয়েলের অবস্থার দিকে সবসময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। চরম গরম-ঠাণ্ডার মধ্যে দোল খাওয়া,

অত্যধিক কম্পন ও চাপের মধ্য দিয়ে যাওয়া এই অয়েলের উত্তাপ ও মজুদ নিয়ে তাঁদের প্রায়ই দুশ্চিন্তায় থাকতে হয়। ইঞ্জিনের অধিক পাওয়ার হবার আরো অসুবিধা হল এতে এর ঘূর্ণনগতি বেড়ে যায়। প্রপেলারকে যাতে তার নির্দিষ্ট ঘূর্ণনগতিতে রাখা যায় সেজন্য তখন গিয়ারের সাইজ ও সংখ্যা বাড়াতে হয়—যা বিমানকে আরো ভারী করে ফেলে। এসব কারণে আজকাল অপেক্ষাকৃত ছোট বিমানের জন্যই প্রপেলারকে উপযুক্ত মনে করা হয়।

প্রপেলার-বিমানের আর একটি দোষ হল খুব উঁচু দিয়ে চলার সময় বাতাস পাতলা হয়ে যাওয়াতে প্রপেলারের কার্যকারিতা কমে যায়। আবহাওয়াগত অধিকাংশ ঝকমারি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিমান ৩৫ হাজার ফুটেরও উপর দিয়ে চলা পছন্দ করে, অথচ এরকম উচ্চতায় একটি প্রপেলার তার সমুদ্র-সমতলের পাওয়ারের মাত্র এক-চতুর্থাংশ বজায় রাখতে পারে।

বিমানের পিস্টন ইঞ্জিনের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনটি অপেক্ষাকৃত অধিক। উচ্চতার বিরাট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মিনিটে ১২০০০ ঘূর্ণনগতিতে এতসব চলমান

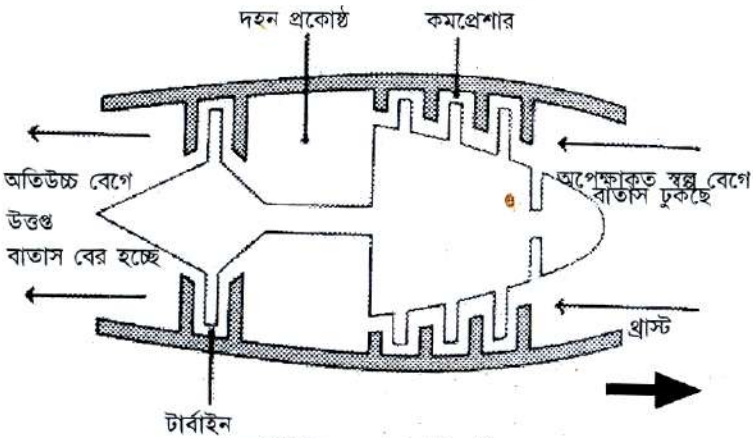

জেট ইঞ্জিন যেভাবে থ্রাষ্ট সৃষ্টি করে

অংশের সমন্বয়ে চলতে গিয়ে এমনটি হয়। জেট ইঞ্জিন সেদিক থেকে খুব আরামে থাকে বলতে হবে। এতসব তুলনামূলক অসুবিধা সত্ত্বেও তার নিজস্ব ভুবনে দক্ষতা ও ব্যয়সাশ্রয়িতার কারণে প্রপেলার বিমান এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী রয়ে গেছে।

জেট ইঞ্জিন

জেট ইঞ্জিন সব দিক থেকে সরল। এর নীতিটি খুব সহজ। এর পাওয়ারের তুলনায়

আকারটি নেহাত ছোটখাটো এবং হালকা। গঠনের মধ্যে জটিলতা কম, চলমান অংশও এর খুব কম। অথচ ঘন্টায় ৪০০ মাইলের উপরের বেগে উড়তে হলে এর দক্ষতার তুলনা নেই। এর পর থেকে যত বেগ, এটি তত দক্ষ—ঘণ্টায় হাজার মাইলেরও বেশ কিছু উপরে না পৌঁছা পর্যন্ত এমনই অবস্থা। প্রপেলার ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে এর ঠিক উলটোটাই দেখেছি। সেক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট বেগের উপরে বেগ বাড়লে দক্ষতা দ্রুত কমে আসে।

জেট ইঞ্জিন সবচেয়ে স্বচ্ছন্দে ও দক্ষভাবে চলে অধিক উচ্চতায়—৩৫,০০০ হাজার থেকে ৪০,০০০ ফুট উচ্চতা তার বেশি পছন্দ। এখানেও ব্যাপারটি প্রপেলার ইঞ্জিনের ঠিক উলটো। উচ্চবেগে, বিশাল ওজন নিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার যে-বিষয়টি এখন বিমানভ্রমণের নিত্যকার ছবি, জেট ইঞ্জিন ছাড়া এটি কখনোই সম্ভব হত না। আর দিনের পর দিন প্রায় বিরামহীনভাবে সামান্য রক্ষণাবেক্ষণে এটি এ-কাজ করে যেতে পারে। কারণ পিস্টন ইঞ্জিনকে যেখানে এক হাজার বা তারও কম ঘণ্টা ওড়ার পরই একবার পূর্ণ ওভারহল করতে হয়, জেট ইঞ্জিনকে তা করতে হয় বিশ হাজার ঘণ্টা ওড়ার পর।

জেট ইঞ্জিনের সামনে থাকে একটি কমপ্রেশার যার ব্লেডগুলো ঘুরে-ঘুরে বাতাসকে শুষে নেয় আর সংকোচনের মাধ্যমে এর চাপ প্রায় সাড়ে তিনগুণ বাড়িয়ে নেয়। এই সংকুচিত বাতাস দহনপ্রকোষ্ঠে গেলে সেখানে জ্বালানি ঢুকিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। দহনের ফলে উত্তপ্ত বাতাস প্রসারিত হয়ে একটি টারবাইনের মধ্য দিয়ে উচ্চগতিতে ত্বরণ লাভ করে। একে তারপর বহির্গমন পথ 'প্রপালশন নোজলের' ভেতর দিয়ে পেছনের দিকে সজোরে বের করে দেয়া হয়। এই বাতাসের নির্গমনের প্রতিক্রিয়ায় জোরে বিমান এগিয়ে যায়। যাবার পথে যে-টারবাইনকে এটি ঘুরিয়ে যায় সেটি আবার যুক্ত থাকে সামনের কমপ্রেশারের সঙ্গে। এই কারণেই কমপ্রেশারটি ঘুরতে থাকে। গতিবেগ যখন বাড়ে, আরো বেশি পরিমাণে বাতাস কমপ্রেশারে ঢোকে বলে ইঞ্জিন আরো দক্ষ হতে থাকে। উচ্চতা বাড়লে পাতলা বাতাসে বিমানের ড্র্যাগ (বাতাসের ঘর্ষণের বাধা) কমে যায় বলে অল্প জ্বালানিতেই বেশি গতি পায়। ফলে উচ্চতাও এর দক্ষতা বাড়ায়।

আসলে জেট ইঞ্জিনের অগ্রগণ্যতাটাই হল অধিক বেগের জন্য—যে-রকম বেগ প্রপেলার ও অন্তর্দহন ইঞ্জিন সৃষ্টি করতে পারে না। প্রপেলার থ্রাস্ট সৃষ্টি করে প্রচুর পরিমাণ বাতাসকে নিজের উপর কাজে লাগিয়ে। অন্যদিকে জেট ইঞ্জিন থ্রাস্ট সৃষ্টি করে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ বাতাসের বেগ অনেক গুণে বাড়িয়ে দিয়ে দহনের মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়ায় থ্রাস্ট সৃষ্টি হয় অনেক বেশি। তবে এর দুর্বলতা হল এতে যত এনার্জি বা পাওয়ার সৃষ্টি হচ্ছে তার সবটুকু বিমানকে এগিয়ে নিতে কাজে লাগে না,

কিছু অংশ অপচয় হয়। এরকম অপচয় কম বলে প্রপেলারের দক্ষতা বেশি, যদি তার অল্প গতি মেনে নিতে পারি। এজন্য যাত্রীবাহী বিমান যেগুলো ঘণ্টায় পাঁচশো মাইল বা তার বেশি বেগে চলে, অথচ সুপারসনিকের মতো অত দ্রুতও নয় সেগুলোতে ব্যবহৃত হয় টার্বোফ্যান ইঞ্জিন যাতে জেট ইঞ্জিনের সামনে অনেকগুলো ব্লেডের একটি

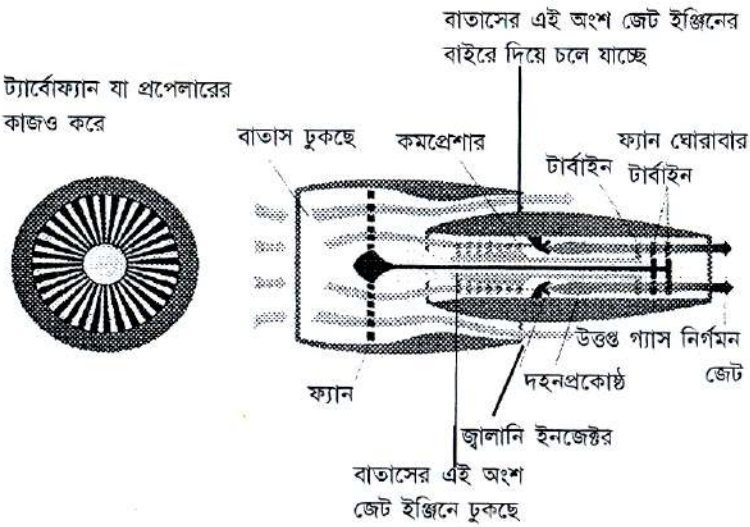

টার্বোফ্যান ইঞ্জিনের গঠন। বামে : সামনে থেকে দেখা ফ্যান

ফ্যানও লাগানো থাকে যা ইঞ্জিনের টারবাইনের সাহায্যে ঘুরে বাইরের বাতাস টেনে নেয়। কিছু বাতাস জেট ইঞ্জিনে কমপ্রেশারে ঢোকে, কিন্তু বাকি বেশির ভাগ কমপ্রেশারের বাইরে দিয়ে পেছনে চলে যায়। এই শেষোক্ত বাতাসের ক্ষেত্রে ফ্যানটি প্রপেলারের কাজ করে। ফলে টার্বোফ্যানে প্রপেলারের দক্ষতা, আর জেটের থ্রাস্ট, উভয়ের বৈশিষ্ট্য সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় গতিবেগ পাওয়া যায়। আজকের যাত্রীবাহী বড় বিমানগুলোর প্রায় সবই এরকম টার্বোফ্যান জেট ইঞ্জিনের দ্বারা চালিত। এতে জ্বালানি সাশ্রয় হয়।

আরো একধরনের ইঞ্জিন জেট ও প্রপেলার উভয়ের সমন্বয়ে কাজ করে, সেগুলো হল টার্বোপ্রপ। এতে জেট ইঞ্জিনের ঐ টারবাইনই একটি সত্যিকারের প্রপেলার ঘোরাবার ব্যবস্থা করে। থ্রাস্ট এখানে প্রায় পুরোপুরিই প্রপেলারের কাছ থেকেই আসে—শুধু এর শক্তিটা যোগায় জেটের শক্তি। অল্পকিছু থ্রাস্ট অবশ্য জেট থেকেও আসে। প্রপেলার ইঞ্জিনের দক্ষতা যে-বেগে কমতে আরম্ভ করে, অথচ জেট ইঞ্জিনের মতো অধিক থ্রাস্টের অপচয়ী ব্যবস্থায় ঠিক পোষায় না সেই মাঝখানটাতে—অর্থাৎ

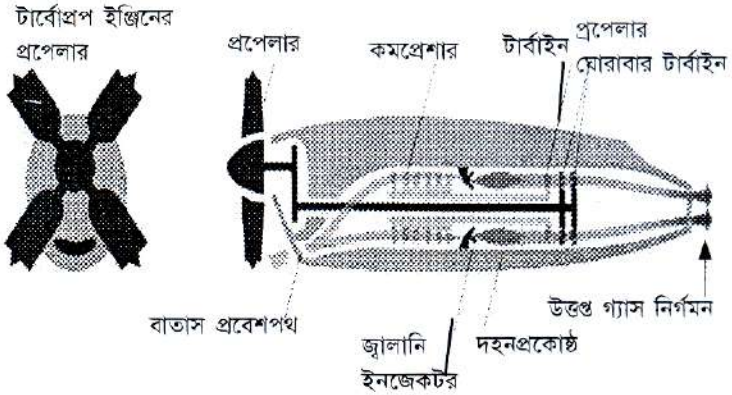

টার্বোপ্রপ ইঞ্জিনের গঠন। বামে সামনে থেকে প্রপেলারটি দেখা যাচ্ছে

ঘণ্টায় ৪০০ মাইলের কাছাকাছি বেগে নিকটপাল্লার বিমানে টার্বোপ্রপ কিছুটা সুবিধাজনক। আমাদের দেশে এটিপি (অ্যাডভান্সড টার্বোপ্রপ) বিমানগুলোতে এর ব্যবহার আমরা দেখেছি।

জেট ইঞ্জিনকে ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থাটাও অতি সরল। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় একে ঠাণ্ডা রাখা হয়—পিস্টন ইঞ্জিনের জবড়জং কুলিং সিস্টেম এখানে নিষ্প্রয়োজন। জেট ইঞ্জিনের শত্রু হল এর অত্যধিক উত্তাপ আর টারবাইন ব্লেডের উপর সৃষ্ট চাপ। দহনপ্রকোষ্ঠের উত্তাপ ২০০০° সে. ছাড়িয়ে যায়। টারবাইনকে ঘুরতে হয় মিনিটে ২০,০০০ ঘূর্ণনে ৫০০° সে. উত্তাপে। এসব সত্ত্বেও জেট ইঞ্জিন সহজে বিকল হয় না কারণ এটি খুবই সহিষ্ণু একটি যন্ত্র। এর চেয়ে ঢের বেশি সমস্যা হয় এর আনুষঙ্গিক অন্যান্য যন্ত্র নিয়ে, জেট ইঞ্জিনের শক্তিতে যেগুলো চলে—যেমন হাইড্রলিক পাম্প, জেনারেটর ইত্যাদি। শেষ অবধি ইঞ্জিনের ক্ষতি সবচেয়ে বেশি করে এর সামনের ফ্যানের দ্বারা পাথর, শিলাবৃষ্টি, পাখি ইত্যাদি শোষণ করে নেবার প্রবণতা। রক্ষণাবেক্ষণের চেকিং করার সময় কমপ্রেশার ও টারবাইনের প্রত্যেকটি ব্লেডকে এক্সরে, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ইত্যাদি বিভিন্ন সূক্ষ্ম পরীক্ষার মাধ্যমে তন্নতন্ন করে দেখা হয় এর কোনোটিতে বিন্দুমাত্র কোনো ফাটল বা ক্ষয়ের লক্ষণ আছে কি না। শুধু তা-ই নয়, যে-লুব্রিকেন্ট অয়েলে এটি মাখামাখি থাকে ব্যবহৃত সেই অয়েলের নমুনাও স্পেকট্রোমিটারে পরীক্ষা করা হয় ওর মধ্যে ব্লেডের ধাতব বস্তুর ছিটেফোঁটা হদিশও পাওয়া যায় কি না দেখতে—যা তার ক্ষয় ইশারা করবে। ল্যান্ডিং-এর সময় ভূমি ছোঁয়ামাত্রই বিমানকে দ্রুত রানওয়ের উপরেই থামিয়ে ফেলার জন্য ব্রেক কষতে হয়। এটি যদি শুধু চাকার দিকে যান্ত্রিক ব্রেক প্রয়োগের মাধ্যমে করার চেষ্টা করা হয়

তা হলে রাবারের চাকা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই জেট ইঞ্জিনের রিভার্স থ্রাস্টের (উলটো ধাক্কা) সাহায্য নিতে হয়। ভূমি ছোঁয়ার আগে-আগে বাতাসে থাকতেই পাইলট থ্রটলকে উপরের দিকে একটি ফাঁকের মধ্য দিয়ে রিভার্স থ্রাস্টের পজিশনে নিয়ে আসেন অনেকটা গাড়ির গিয়ার বদলাবার মতো। এর ফলে ইঞ্জিনের পেছনে প্রোপালশন নোজল দিয়ে উত্তপ্ত বাতাস বের হয়ে যাওয়ার রাস্তা ঝিনুকের খোলার মতো দুটি কপাট জুড়ে গিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এই বাতাস বরং এখন অন্য পথে সজোরে সামনের দিকে নির্গত হয়, যা তার প্রতিক্রিয়ায় বিমানকে পেছনে নেবার চেষ্টা করে কার্যত একে থামিয়ে দেয়। প্রপেলার বিমানে এটি প্রপেলারের পিচ উলটে দিয়ে করতে আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি।

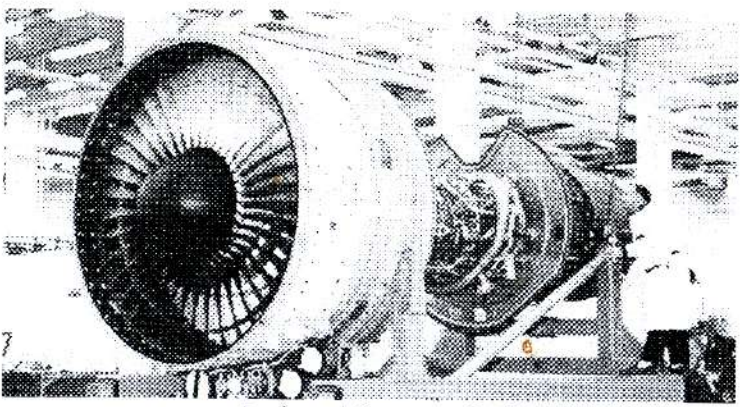

খোলা অবস্থায় টার্বোফ্যান ইঞ্জিন, বড় যাত্রীবাহী বিমানে যা এখন প্রায় সবক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে

বিমানে ইঞ্জিনের অবস্থান

বিভিন্ন ধরনের বিমানে ইঞ্জিন বিভিন্ন অবস্থানে থাকতে পারে। ছোট এক ইঞ্জিনের প্রপেলার বিমানের ক্ষেত্রে এটি নাকের ডগায় থাকাই স্বাভাবিক। দুই বা চার ইঞ্জিনের প্রপেলার ইঞ্জিন ডানার উপর দু'পাশে বিভক্ত করা থাকে। কোনো-কোনো বিমানে প্রপেলার পেছনেও থাকে, যদিও সেটি খুবই বিরল।

জেট ইঞ্জিনের অবস্থানে আরো নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। এগুলোর প্রত্যেকটির কিছু সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে। ডানার একেবারে গোড়াতে ফিউজল্যাজের প্রায় সঙ্গেই গুঁজে দিয়ে দু'পাশে দুটি জেট ইঞ্জিন থাকতে পারে। এতে সুবিধা হল যে থ্রাস্টটি বিমানের মধ্যরেখার খুব কাছাকাছি বরাবর ঘটে। একটি ইঞ্জিন যদি অচল হয়ে পড়ে

তাতেও থ্রাস্টের ভারসাম্যে বেশি তফাত ঘটে না। কিন্তু ইঞ্জিনকে ফিউজল্যাজের এত কাছে রাখলে যাত্রীবাহী ক্যাবিনের ভেতর আওয়াজ খুব বেড়ে যায়। তা ছাড়া ফিউজল্যাজের নৈকট্য ইঞ্জিনের বায়ুপ্রবাহের মসৃণতায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

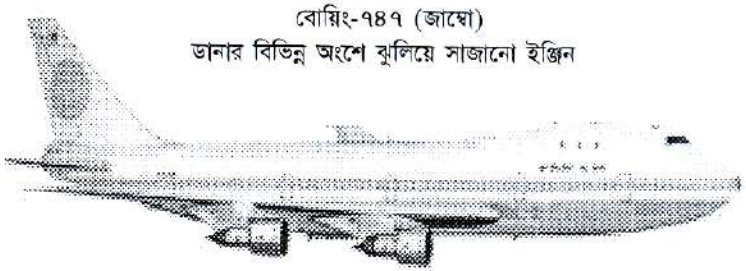

বোয়িং-৭৪৭ (জাম্বো)
ডানার বিভিন্ন অংশে ঝুলিয়ে সাজানো ইঞ্জিন

এখন ইঞ্জিনকে ফিউজল্যাজ থেকে দূরে নিয়ে ডানা থেকে ঝুলিয়ে দেয়ার নিয়মটিই বেশি প্রচলিত রয়েছে। এতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইঞ্জিনের কাছে যেতে সুবিধা হয়, বায়ুপ্রবাহে ফিউজল্যাজ বাধ সাধতে পারে না, ভেতরে শব্দ কমে যায়। কিন্তু অসুবিধা হল এগুলো ঝোলানো অবস্থায় থাকে বলে ইঞ্জিনের কম পাওয়ারের অবস্থায় বিমানের নাক একটু ঝুঁকে পড়া অবস্থায় চলে যায়। এক্ষেত্রে একটি ইঞ্জিন অচল হয়ে থ্রাস্ট হারালে বিমান সেদিকে ঘুরে যাবার চেষ্টা করে, তখন সারাক্ষণ প্রচুর রাডার ব্যবহার করে এই প্রবণতা রোধ করে বিমানকে ভারসাম্যে রেখে উড়তে হয়। চার ইঞ্জিনের (যেমন বোয়িং-৭৪৭) অথবা দুই ইঞ্জিনের (যেমন বোয়িং-৭৬৭) আধুনিক যাত্রী-বিমানগুলোতে এই ব্যবস্থাই চালু রয়েছে।

তিন ইঞ্জিনের বিমানে (যেমন বোয়িং-৭২৭, ডিসি-১০ ইত্যাদি) দুটি ইঞ্জিনকে যথারীতি দু'দিকে ডানায় রেখে তৃতীয়টি লেজের কাছে ফিউজল্যাজের উপর চড়িয়ে দেয়া হয়। কোনো-কোনো বিমানে দুটি ইঞ্জিনও এভাবে পেছনে লেজের দু'পাশে দিয়ে দেয়া হয় (যেমন ডিসি-৯ বিমানে)। ইঞ্জিন পেছনে থাকলে ডানা অপেক্ষাকৃত ভারমুক্ত থাকে। ক্যাবিনে আওয়াজও কম হয়। পেছনের ইঞ্জিন অচল হলে ভারসাম্যহীনতার অবস্থা তেমন দেখা দেয় না। অপরপক্ষে এরকম বিমানে ক্যাবিনের কিছু জায়গা ইঞ্জিনের জন্য ছেড়ে দিতে হয় বলে যাত্রীর জন্য জায়গা কমে যায়। ইঞ্জিনে বাতাস আসার প্রবাহ ডানা ও ফিউজল্যাজের কারণে কিছুটা বিঘ্নিত হতে পারে। পেছনের ইঞ্জিন বিমানকে পাছা-ভারী করে তোলে। পেছনের পর্যাপ্ত লিফ্‌ট্ নিশ্চিত করার জন্য ডানাকে কিছুটা পেছনে সরিয়ে দিতে হয়, তা ছাড়া লেজের ছোট ডানাটিকে অপেক্ষাকৃত বড় করতে হয়। আর ইঞ্জিনের জায়গা করে দেবার জন্য এই

লেজের ডানাকে উঠিয়ে আনতে হয় উপরে অনেকটা T অক্ষরের মতো আকৃতি দিয়ে। এসবের ফলে বিমানের নিয়ন্ত্রণে কিছুটা জটিলতা আনতে হয়।

দীর্ঘদিন ধরে বড় পরিসরের বিমানগুলো চার অথবা তিন ইঞ্জিনের হওয়াটাই চলে আসছিল। কিন্তু সুপরিসর আধুনিকতম বিমানে এখন এর ব্যতিক্রম হচ্ছে। তাতে দুটি শক্তিশালী ইঞ্জিনই ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে বোয়িং-৭৬৭ এবং তারপর আরো অগ্রসর বোয়িং ৭৭৭ এর মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন একটি প্রজন্ম সৃষ্টি হয়েছে। নানা দিক থেকে একে একবিংশ শতাব্দীর যাত্রীবাহী বিমান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, আর এটি দুটি টার্বোফ্যান ইঞ্জিনেই চলে। এর ইঞ্জিনের শক্তি এবং নির্ভরযোগ্যতা এত বেশি যে চার বা তিন ইঞ্জিনের চেয়ে এর দুটিই বরং অধিকতর কাম্য। বলা হচ্ছে যে মহাশূন্যে মানুষ যাবার প্রথম দিকের বুস্টার রকেটের চেয়েও শক্তিশালী এই ইঞ্জিন।

দুই ইঞ্জিনের খুবই নির্ভরযোগ্য বড় বিমান সম্ভব হওয়াতে বিমান চালাবার ব্যয়ও কমে গেছে-এদের জনপ্রিয়তার এটিও একটি কারণ। ব্যয় কমার আর একটি কারণ এর ফলে যাত্রাপথও কোন-কোন ক্ষেত্রে সংক্ষেপ করা গেছে। অতীতে নিয়ম ছিল স্থল বা জলের উপর বিমানের যাত্রাপথের কোন অংশ অবতরণযোগ্য একটি বিমান বন্দর থেকে এক ঘন্টার পথের বেশি দূরে থাকতে পারবেনা। এর ফলে এই কারণেই অনেক সময় বিমানকে একটু ঘুরা পথে যেতে হতো। এখন ইঞ্জিনের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে সর্বাধুনিক বিমানের ক্ষেত্রে যাত্রাপথকে অবতরণযোগ্য বিমান বন্দর থেকে দুই ঘন্টায় যেতে পারার মত দূরত্বে রাখলেই চলবে।

উড়তে-উড়তে হালকা

বিমানের ইঞ্জিন প্রচুর জ্বালানি ব্যয় করে। দীর্ঘপথে যাত্রা শুরু করার সময় বিমানের ওজনের একটি বড় অংশই থাকে জ্বালানির ওজন। যতই যাত্রা এগুতে থাকে জেট ইঞ্জিন তৃষ্ণার্তের মতো সেই জ্বালানি পুড়ে শেষ করে, আর বিমানের ওজন কমতে থাকে। ফুয়েল ট্যাঙ্কের অবস্থান অনুযায়ী কোন অংশ থেকে এ ওজন কমছে তার উপর বিমানের ভরবিন্দুর অবস্থান এবং ভারসাম্য নির্ভর করে। এই দিক থেকে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি এড়াতে জ্বালানি ব্যবহারের একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা থাকতে হয়। এভাবে একটি ডিসি-১০ বিমান শেষ অবধি ৬০ টন ওজন কমিয়ে ফেলে জ্বালানি পোড়ার ফলে। এই জ্বালানি কিন্তু একভাবে পোড়ে না, তার অনেক ওঠানামা ঘটে, বিমানের পাওয়ারের প্রয়োজনীয়তার হেরফেরের কারণে।

একটি বোয়িং-৭২৭ সাইজের বিমান টেইকঅফের সময় খরচ করে মিনিটে ৭৬ গ্যালন তেল, টেইকঅফের ঠিক পরে বসত অঞ্চলে আওয়াজ কমাবার প্রয়োজনে কমিয়ে মিনিটে ৩২ গ্যালন, উড্ডয়ন উচ্চতায় পৌছার জন্য আরোহণের সময় মিনিটে ৪৫ গ্যালন, সমগতিতে উড্ডয়নের সময় মিনিটে ২৪ গ্যালন, নিচে নেমে আসার সময় মিনিটে ১২ গ্যালন, ল্যান্ডিং-এর সময় মিনিটে ৩২ গ্যালন এবং ল্যান্ডিং-এর পর রিভার্স থ্রাস্ট প্রয়োগের সময় মিনিটে ৫০ গ্যালন। একেবারে নিম্নউচ্চতায়, নিম্নগতিতে চলার সময় জেট ইঞ্জিন যে কীরকম অদক্ষ তা এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে, মাটির উপর চলার সময় তো বটেই। আর উচ্চ উড্ডয়ন উচ্চতা (৩৫০০০ ফুটের মতো) ও অধিক বেগে উড্ডয়নের সময় এটি যে কীরকম দক্ষ তাও বোঝা যাচ্ছে।

এত বিভিন্ন হারে বিভিন্ন প্রয়োজনে জ্বালানি ব্যয় করতে হয় বলে জ্বালানি

ব্যবস্থাপনার উপর পাইলটের বেশ দক্ষতা থাকতে হয়। আসলে এটি তাঁর কাজের একটি বড় অংশ। জ্বালানিখাতে ব্যয়টি উড্ডয়নের একটি বড় ব্যয়ও বটে, অবহেলাভরে এই ব্যয়বৃদ্ধি কারো কাম্য নয়। সঠিক পরিমাণে জ্বালানি নেয়াটা খুব জরুরি। কিছু জ্বালানি বাড়তি রাখতে হয় অজানা অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য— আবহাওয়াগত কারণে গতিপথ পরিবর্তন করতে হতে পারে, নির্দিষ্ট এয়ারপোর্টে না নেমে দূরে কোথাও বিকল্প অবতরণ করতে হতে পারে। অনেক সময় অতিরিক্ত এয়ার ট্রাফিকের কারণে বা অন্য কোনো কারণে গন্তব্যে পৌছেও অনেকক্ষণ ধরে একই জায়গায় ঘুরে-ঘুরে উড়তে হতে পারে। তার পরেও প্রয়োজনের অনেক বেশি জ্বালানি নিয়ে বিমান ভারী করাটা বোকামি হবে। এইসব দিকে লক্ষ রেখে কতখানি জ্বালানি গেল কতখানি রইল সেই বিবেচনা পাইলটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

গন্তব্যের ঠিক কত কাছে পৌছে নিচের দিকে নামা শুরু করা হবে তার উপরও জ্বালানি-সাশ্রয় নির্ভর করে। একটি সোজা নিয়ম হচ্ছে গন্তব্য থেকে প্রতি এক মাইল দূরত্বের জন্য বিমানের ৩০০ ফুটের মতো উচ্চতা প্রয়োজন হবে। তা হলে যে-বিমান ৩০ হাজার ফুট উপর দিয়ে চলছে তাকে ১০০ মাইল দূরে থাকতেই নামা শুরু করতে হবে যদি জ্বালানির সঠিক ব্যবহার করতে হয়। নানা কারণে অবশ্য এ-হিসেবে কিছু হেরফের পাইলট করতে পারেন।

সিটবেল্ট বেঁধে নিন

এতক্ষণ বিমানটির তত্ত্ব নিতে গিয়ে নিজের যাত্রার কথাই ভুলে ছিলাম। পাইলট যখন টেইকঅফের প্রস্তুতির কথা বলে সবাইকে সিটবেল্ট বাঁধতে বললেন তখন নিজেকেও কিছু-একটা করতে হল, আর যাত্রার দিকে মনোযোগ গেল। কয়েকটি নিষেধাজ্ঞাও একই সময় জারি করা হয়েছে। এখন থেকে মোবাইল ফোন অন রাখা যাবে না পুরো যাত্রাকালে, কারণ তাতে বিমানের সঙ্গে রেডিয়ো-যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিতে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তা ছাড়া কম্পিউটার ইত্যাদি ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিও টেইকঅফ আর পরে ল্যান্ডিং-এর সময় বন্ধ রাখতে হবে, একই কারণে।

ক্যাপ্টেন ও তাঁর ফ্লাইট ক্রুরা ইতোমধ্যে ফ্লাইট-ডেকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের ব্যস্ততা অবশ্য বেশ খানিকটা আগে থেকেই শুরু হয়েছিল, বিমানে আসার আগে ডিউটিরুমে। সেখান থেকে এই ফ্লাইটের যাত্রাপথের ম্যাপ তাঁরা সংগ্রহ করেছেন, প্যাসেঞ্জার ও কার্গো সম্পর্কেও তথ্য নিয়েছেন। আবহাওয়া অফিস পাঠিয়েছে যাত্রাপথের আগাগোড়া অঞ্চলের সর্বশেষ আবহাওয়া প্যাটার্ন—যার মধ্যে বায়ুবেগ, মেঘ, তাপমাত্রা, বায়ুচাপ, বিশেষ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ইত্যাদি সবই রয়েছে। ফ্লাইট-ডেকে গিয়ে তাঁদেরকে দীর্ঘ একটি চেকলিস্ট ধরে একে একে অনেকগুলো ফ্লাইট-পূর্ব চেক সম্পন্ন করতে হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় সবরকমের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ও তথ্য পাওয়ার যন্ত্রপাতি রয়েছে। রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সুইচ, লিভার, বাতি, মিটার, সতর্কীকরণ বেল বা অন্য বিভিন্ন আওয়াজ। সবকিছু তাঁর সন্তুষ্টিমতো পেলে ক্যাপ্টেন তাঁর টেইকঅফ পরিকল্পনা নেবার কাজে মন দেবেন—বিশেষ করে টেইকঅফ বেগ নির্ণয় করার কাজে।

টেইকঅফ বেগ নির্ণয় করার জন্য ক্যাপ্টেনকে জানতে হচ্ছে বিমানের মোট ওজন—যার মধ্যে যাত্রী, মাল, জ্বালানি সবই ধর্তব্য। এ সবেরই হিসাব ইতোমধ্যে তাঁর জানা হয়েছে। তা ছাড়া জানতে হচ্ছে বাতাসের তাপমাত্রা, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এয়ারপোর্টটির উচ্চতা এবং বায়ুবেগ। এর থেকেই তিনি পাবেন টেইকঅফের প্রয়োজনীয় বেগ আর সেই বেগ অর্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় ইঞ্জিন পাওয়ারের থ্রটল সেটিং। পাওয়ার বেশি লাগবে যদি বিমান ভারী হয়, বাতাস গরম হয়, গরম ও উচ্চতার কারণে বাতাস পাতলা হয়, বিমানের গতির বিপরীত দিক থেকে বাতাসের ভালো গতি থাকলে পাওয়ার কম লাগবে। সমুদ্র-সমতল থেকে কয়েক হাজার ফুট উপরে এয়ারপোর্টে পাওয়ারের প্রয়োজনীয়তা সমুদ্র-সমতলের চেয়ে দ্বিগুণ বেশিও লাগতে পারে। লন্ডনে টেইকঅফ করতে বিমানের যে-পাওয়ার লাগবে, একই ওজন নিয়ে বাহরাইন থেকে টেইকঅফ করতে তার চেয়ে অনেক বেশি পাওয়ার লাগবে—তাপমাত্রার কারণে। কাজেই সর্বোচ্চ কত ওজন বহন করে বিমান টেইকঅফ করতে পারবে তা এয়ারপোর্টের অবস্থান ও অবস্থার উপরও অনেকখানি নির্ভর করে।

টেইকঅফের মধ্যেও তিনটি বিভিন্ন গতিবেগ পাইলটকে ব্যবহার করতে হয়। প্রথমটি হল সিদ্ধান্ত-বেগ। এই বেগে পৌঁছে গেলে পাইলটের আর কোনো সুযোগ থাকে না টেইকঅফের সিদ্ধান্ত পালটাবার—তাঁকে উড়তেই হবে। দ্বিতীয়টি হল নাক-উঁচু-করা বেগ। এই বেগে পৌঁছলে স্টিকটি টেনে তিনি বিমানের নাক উঁচু করবেন, যাতে নাকের নিচের চাকাটি ভূমি থেকে আলগা হয়। তৃতীয়টি হচ্ছে নিরাপদ আরোহণ বেগ। ভূমি ছেড়ে উড্ডয়ন ও আরোহণের অবস্থায় নিরাপদে পৌঁছতে হলে এই বেগ থাকতে হবে। তিনটি বেগই হিসাব করে নেবার পর পাইলট সাধারণত স্পিড ইন্ডিকেটরে চিহ্নিত করে রাখেন। কিন্তু এগুলো ব্যবহারের আগে তাঁকে টেইকঅফ করার জন্য রানওয়ের সঠিক স্থানে পৌঁছতে হবে।

এর মধ্যে তিনি অনবরত কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে সংযোগ রাখছেন। ওদের অনুমতি নিয়েই তিনি ইঞ্জিন চালু করবেন। কমপ্রেশার ফ্যান ঘোরানো আরম্ভ হয় উচ্চচাপের বাতাসের ঝাপটা দিয়ে, একই সঙ্গে ইঞ্জিনে জ্বালানিপ্রবাহ চালু করে দহন শুরু করা হয়। 'নাকে দড়ি দিয়ে' কিছুটা পথ হয়তো একটি বলশালী গাড়ি বিমানকে টেনে নিয়ে যায়—ট্যাক্সি করে এগোবার জন্য পরিষ্কার রাস্তায় না পৌঁছানো পর্যন্ত। তার পর থেকে বিমান নিজের ইঞ্জিনের গতিতেই এগোয়। এভাবে এয়ারপোর্টের রাস্তা দিয়ে এগুনোকেই বলা হয় বিমানের ট্যাক্সি করা। এ-সময় পাইলট বিমানের ডান-বাম করেন নাকের কাছের চাকাটি স্টিয়ারিং হুইলের সাহায্যে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে। বেশ অল্প বেগেই এগুতে হয়। এ-সময় চলতে-চলতে আরো কিছু ফ্লাইট-পূর্ব চেকিং সম্পন্ন করা হয়। গাড়ির মতোই চালানো, গাড়ির মতোই চাকার ব্রেক

কষা—যদিও বিমান জেট ইঞ্জিনে চলছে। এভাবেই আমাদের বিমান পৌঁছে গেল রানওয়ের প্রান্তে। এখানে একটু অপেক্ষা করতে হবে কারণ আগের বিমানগুলো টেইকঅফ করার পর আমাদের পালা এলে, কন্ট্রোল টাওয়ারের অনুমতি মিললে তারপর আমাদের টেইকঅফ।

ক্যাবিন-ক্রুরা অর্থাৎ যাত্রী দেখাশোনার দায়িত্বপ্রাপ্তরাও এখন টেইকঅফের প্রস্তুতি হিসাবে তাঁদের সিটে বসে সিটবেল্ট বেঁধে নিয়েছেন। পার্কিং ব্রেইক তুলে নেয়া হয়েছে। ডানার ফ্ল্যাপ অংশত নামানো হয়েছে টেইকঅফে বেশি লিফ্‌ট্ পাওয়ার প্রয়োজনে। যেই ট্রান্সপন্ডার যন্ত্রের বেতারসংকেত পেয়ে উড্ডয়নের পথে সকল কন্ট্রোল টাওয়ারের রাডার এই বিমানটিকে আলাদা করে চিনতে পারবে সেটিও সেট করে দেয়া হয়েছে। টাওয়ার থেকে টেইকঅফ ক্লিয়ারেন্স দেয়া হয়ে গেছে। ইঞ্জিনের গর্জন এখন ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠেছে এবং বিমানের গতির বাঁধ ভেঙে গেছে।

রানওয়ে ধরে বিমান ক্রমেই অধিক বেগ নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে। ফ্লাইট-ডেকে পাইলটের সামনে অনেকগুলো মিটার, সুইচ, বাতি ইত্যাদি। এসবের মধ্যে কয়েকটির উপর এখন তাঁদের অখণ্ড মনোযোগ। একটি হল গতিবেগ মাপার জন্য এয়ার স্পিড ইন্ডিকেটর। আর একটি হল আর্টিফিশিয়াল হরাইজন বা কৃত্রিম দিগন্ত। এটি দিগন্তের তুলনায় বিমান কীভাবে হেলে রয়েছে তা দেখায়। এতে একটি বিমানের মডেল রয়েছে একটি রেখার উপর-নিচে—যা হল দিগন্তরেখা। যদি মডেলটি রেখার নিচে থাকে তা হলে বিমানের নাক নিচের দিকে, যদি উপরে থাকে তা হলে নাক উঁচু রয়েছে এবং বিমান উপরে উঠছে। যদি রেখা বিমানের মডেলের তুলনায় বামে হেলে তাহলে বিমান বামে কাত হয়েছে ইত্যাদি। আর একটি যন্ত্র হল আরোহণের হার-নির্দেশক, প্রতি মিনিটে কত শত ফুট হারে বিমান উঠছে তা নির্দেশ করে। আলটিমিটার রয়েছে সমুদ্র-সমতল থেকে (অথবা এয়ারপোর্ট থেকে) বিমানের উচ্চতা দেবার জন্য। কম্পাস রয়েছে দিকনির্দেশনার জন্য। অবশ্য এক্ষেত্রে চুম্বক কম্পাসের বদলে জাইরো কম্পাস এবং রেডিয়ো কম্পাস ব্যবহার করা হয়।

বিমান দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। এতক্ষণ ক্যাপ্টেন স্টিয়ারিং হুইল-এ নাকের কাছের চাকা এদিক-ওদিক করে বিমানকে সোজা রাখছিলেন। ঘণ্টায় ৮০ মাইল বেগের উপরে গিয়ে এবার তিনি যথারীতি পায়ে রাডার (লেজের কাছের হলে) এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে এ-কাজ করবেন। শিগ্‌গির হিসাব-করা টেইকঅফ বেগগুলোর একটি এসে গেল। কোপাইলট আওয়াজ করে জানিয়ে দিলেন যে, সিদ্ধান্তবেগ এসে গেছে। এখন অবশ্যই টেইকঅফ করতে হবে। সাধারণত ঘণ্টায় দেড়শো মাইল বেগে এই সীমা এসে যায়। রানওয়ের একটি সাইনবোর্ড জানিয়ে দিল আর ১০০০ ফুট রানওয়ে রয়েছে। রানওয়ের চিহ্নগুলো এখন আবছা একাকার। লিফ্‌ট্ তৈরি হয়ে ডানা নিজেও

কিছুটা ভার নিতে আরম্ভ করেছে। নাকের কাছের চাকা ভূমিতে রাখার জন্য স্টিকে সামনের দিকে চাপ দিয়ে রাখতে হচ্ছে। এর পরেপরেই নাক তোলার বেগ ঘোষণা করা হল। ক্যাপ্টেন স্টিকে সামান্য টান লাগালেন। নাক উঠে গেল। এর মানে বাতাস কাটার কোণ একটু বাড়ল, লিফ্‌ট্‌ও বাড়ল। বেগ আর একটু বাড়লে বাতাস কাটার কোণ আরো বাড়িয়ে পুরো বিমান উঠে যাবার মতো লিফ্‌ট্‌ তৈরি করা যাবে। দেখতে-দেখতে সেই আরোহণ বেগও এসে গেল। ক্যাপ্টেন আস্তে স্টিক টেনে নিলেন— এলিভেটর পুরো উঠে গিয়ে নাক আরো উঁচু হল, লিফ্‌ট্‌ও বেড়ে গেল অনেক। পেছনের চাকাগুলো একটু ধাক্কা দিয়েই ভূমি ছাড়ল। বিমান এখন পুরোপুরি বাতাসে। এতসব ঘটে গেল দৌড় শুরু করার মিনিটখানেক সময়ের মধ্যে। এবার মুক্ত হাওয়ায় জেট ইঞ্জিন তার ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারছে। বিমান উঠে যাচ্ছে অতিদ্রুত রানওয়েকে নিচে ও পেছনে ফেলে। ইঞ্জিনের সর্বোচ্চ পাওয়ার এখন এর জন্য কাজ করছে। ভূমির সঙ্গে বেশকিছু কোণ করে এটি তাই এখন দ্রুত আরোহণও করতে পারছে। গতির দিক কোনাকুনি ঊর্ধ্বমুখি বলে ডানার উপর বাতাসের প্রবাহও কোনাকুনি। তাই বিমানের এই কোণ কিন্তু ডানার বাতাস কাটার কোণ নয়। সেটি তার চাইতে অনেক কম, নিরাপদ সীমার মধ্যেই রয়েছে।

এখন প্রথম কাজ হল চাকা টেনে তোলা অর্থাৎ চাকাসহ পুরো ল্যান্ডিং গিয়ারকে পেটের ভেতর ঢুকিয়ে তলার কপাট বন্ধ করে দেয়া, চলার পথে যাতে এটি বাধা না হতে পারে। বিমান এখন তলার দিকেও ছিমছাম মসৃণ স্ট্রিমলাইন অবস্থায় চলে এল। গতিবেগ পর্যাপ্ত হলে এবার ডানার বাড়তি ফ্ল্যাপ টেনে ডানাকেও ছিমছাম করে নেয়া হল। ফ্ল্যাপ গুটিয়ে ফেলাতে লিফ্‌টের একটু ঘাটতিতে কেমন যেন দেবে যাচ্ছি মনে হতে পারে, তবে সেটি ক্ষণিকের জন্য, নাক উঁচু করে বিমানের আরোহণ

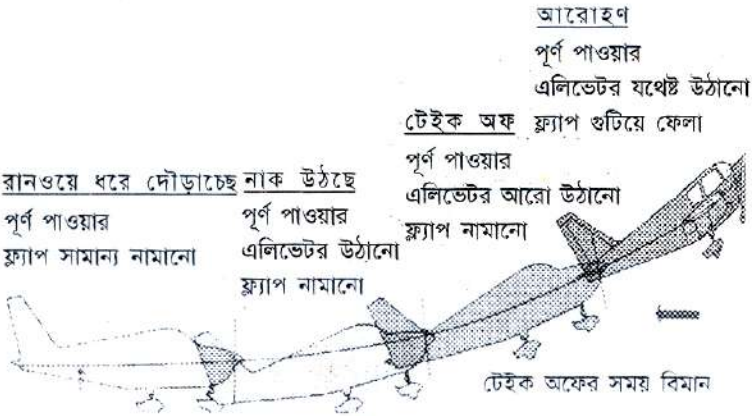

চলছেই, আমরাও পিঠের দিকে খানিকটা শোয়ানো ভঙ্গিতে সে-আরোহণের অংশ।

ভূমি ছেড়ে উঠতে ইঞ্জিনের প্রায় সর্বোচ্চ পাওয়ার প্রয়োগ করতে হয়, ফলে এর শব্দটাও তখন প্রচণ্ড। ওড়ার পরপরই বিমান যতক্ষণ এয়ারপোর্টের কাছাকাছি লোকালয়ের এলাকায় নিচু উচ্চতায় থেকে যাচ্ছে, তখন এই প্রচন্ড গর্জন ঐ এলাকার বসবাস দুর্বিসহ করে তুলতে পারে। তাই নিয়ম হচ্ছে টেইকঅফের পরপর দ্রুত কিছু উচ্চতা—হাজারখানেক ফুট লাভ করেই পাইলট থ্রটল কিছু টেনে নিয়ে ইঞ্জিনের পাওয়ার কমিয়ে আনবেন শব্দনিয়ন্ত্রণের জন্য। এ যেন একধরনের ছন্দপতন। যে-হারে উচ্চতা ও গতি বাড়ছিল, চট করে হারটি কমিয়ে দেয়া হল। চটপট এটি করে, চটপট আবার তার ইতিও টানতে হয়। কাজটিতে অত্যন্ত মনোযোগ প্রয়োজন। থ্রটল কমালে গতি কমে আরোহণ হ্রাস পাবে, লিফ্‌ট্ কমে যাবে। গতি যথাসম্ভব বেশি রাখার জন্য ফ্ল্যাপ গুটিয়ে রাখতে হবে, আবার লিফ্‌ট্ বেশি কমে যাবার আশঙ্কা থাকলে সেটি কিছুটা আবার বের করেও নিতে হবে। এসব করতে-করতে শব্দ কমাবার অঞ্চল ছাড়িয়ে বিমান অনেক উপরে উঠে গিয়েছে।

এবার থ্রটল আবার এগিয়ে দিয়ে পাওয়ার বাড়ানো যায় নিশ্চিন্ত মনে কোনাকুনি আরোহণের জন্য। এ-সময় বিমানের লক্ষ্য হল যত দ্রুত সম্ভব উড্ডয়ন-উচ্চতায় পৌঁছে যাওয়া। কিন্তু সেটি কতক্ষণে সম্পন্ন হবে তা নির্ভর করবে বিমান কত ভারী, আর স্থানীয় তাপমাত্রা কত বেশি তার উপর। ওজন যে উপরে ওঠাকে ধীর করবে সেটা বোঝা কঠিন নয়, কিন্তু তাপমাত্রা? এর কারণ গরম বাতাস অপেক্ষাকৃত পাতলা, আরোহণের জন্য সুবিধার নয়। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, অল্প-ওজন-নেয়া একটা বিমান যেখানে ১৫ মিনিটে ৩০,০০০ ফুট উচ্চতায় উঠে যেতে পারে, গরম আবহাওয়ায় পুরো লোড নিয়ে ওটা উঠতে ৪০ মিনিটও লেগে যেতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে অত উপরে উঠে লাভ কী ? কিছুটা উত্তর তো আমরা ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছি। সেখানে বাতাস হালকা বলে বিমানের গতিপথে বাধা (ড্র্যাগ) কম। জেট ইঞ্জিন ঐ উচ্চতাতেই সবচেয়ে বেশি দক্ষ—তাই অধিক গতি ও জ্বালানি-সাশ্রয়ের জন্য সেটিই জায়গা। আর একটি উত্তর হল আবহাওয়ার নিত্য টানাপড়েনের আওতার বাইরে থাকা।

আসলে অধিক উচ্চতায় চলতে পারার সুযোগটি সর্বজনীন বিমান-চলাচলের ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছে। একসময় বিমানের ভেতরে বাইরে একই বায়ুচাপ থাকত, পাইলট ও যাত্রীকে তাই সহনশীল বায়ুচাপের সীমার মধ্যে থাকতে হত স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস নেবার জন্য। এটি পেরিয়ে হালকা চাপের ঊর্ধ্বাকাশে যাওয়া সম্ভব হত না। বিশেষ কাজে যদি কোনো বিমানকে আরো উপরে যেতেই হত, তা হলে অক্সিজেন মাস্ক পরে নিতে হত। এরপর যখন বিমানের ভেতরটা সবসময় একই স্বাভাবিক বায়ুচাপে রাখার ব্যবস্থা হল (বাইরের বায়ুচাপ যা-ই থাকুক-না কেন)

তখন থেকে এই অসুবিধাটি রইল না। তার পরও প্রপেলার ইঞ্জিনের সুবিধাজনক উচ্চতা ছিল অপেক্ষাকৃত নিচে। জেট ইঞ্জিন এসে উড্ডয়নের স্বাভাবিক ও সর্বোত্তম উচ্চতাকে ৩৫০০০ ফুটের দিকে নিয়ে গেল। এ-উচ্চতা অধিকাংশ মেঘের রাজ্যেরও উপরে। এখন আর বিমানকে ভূমির অপেক্ষাকৃত নিকট বায়ুমণ্ডলের নিত্যকার আবহাওয়ার খেয়ালখুশির উপর নিজকে বেশিক্ষণ সোপর্দ রাখতে হয় না—মেঘ, বৃষ্টি, তুষার, শিলা, ঝড় এসবকে সে নিচে রেখে আসতে পারে যাত্রাপথের অধিকাংশ সময়েই।

সেই নিরাপদ উচ্চতায় আমরা পৌঁছে গেছি। এতক্ষণ, বেশ খানিকক্ষণ আমরা সবাই সিটবেল্ট-বাঁধা ছিলাম, ক্যাবিনের বাতি নেভানো ছিল (আরোহণে বেশি পাওয়ারের প্রয়োজনে বেদরকারি শক্তি ক্ষয় না করার জন্য)। এবার বাতি জ্বলে উঠল, ক্যাপ্টেন সিটবেল্ট বাঁধার সংকেত নিভিয়ে দিলেন। অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গে এও বলে দেয়া হল যে সিটে থাকাকালে কালেভদ্রে হঠাৎ ঝাঁকুনির সম্ভাবনার জন্য সিটবেল্ট বেঁধে রাখাই ভালো। তবে ও-ধরনের অনভিপ্রেত ঝাঁকুনি, বিমানের অপ্রত্যাশিত নড়াচড়া, ভারসাম্যহীনতা—এসব সম্ভাবনা টেইকঅফের পর থেকে ঐ আরোহণ পর্বেই বেশি ছিল। বিশেষ করে খারাপ আবহাওয়া ও ঘন মেঘের তলায় থাকা বা মেঘের ভেতর দিয়ে পার হওয়া বেশ কিছু আন্দোলনের সৃষ্টি করতে পারে। তাই সে-সময় বাধ্যতামূলকভাবে সবাই নিজকে সিটের সঙ্গে আটকে রাখা এবং নট নড়ন-চড়ন। এখন সে-আশঙ্কা কমে গেছে। বিমানবালারা পদচারণা শুরু করেছেন পানীয়, খাদ্য, ভিডিও বিনোদন ইত্যাদির আশ্বাস নিয়ে। সেইসঙ্গে আমরা যাত্রীরাও নড়েচড়ে উঠেছি।

অটোপাইলটের তত্ত্বাবধানে

উড্ডয়ন-উচ্চতায় যাবার পথে বিমানকে সঠিক সমতলে, সমবেগে যাত্রা করিয়ে দিয়ে ক্যাপ্টেন ও তাঁর ফ্লাইট-ক্রুরাও এই প্রথমবার একটু সহজ হবার সুযোগ পেয়েছেন। এই সুযোগ তাঁদেরকে বিশেষভাবে এনে দিয়েছে আধুনিক অটোপাইলট। বিমানচালনার বেশ কিছু দায়িত্ব এবার ঐ যান্ত্রিক পাইলটের উপর ছেড়ে দেয়া যাবে।

আটোপাইলট মূলত বিমানকে স্থির করে দেয়া গতিপথে সঠিক ভঙ্গিতে রেখে চালনা করে যায় প্রয়োজনমতো নিয়ন্ত্রণগুলো ব্যবহার করে। ভঙ্গিতে বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটলেই সে এটি টের পায় আর সঙ্গে-সঙ্গে শুধরে নেবার উদ্যোগ নেয়। এমনকি ক্যাবিন-ক্রুদের বা যাত্রীদের চলাফেরাতেও যে ভারসাম্যে সামান্যতম পরিবর্তন আসবে সেটিও এই নিয়ন্ত্রকের দৃষ্টি এড়ায় না। সেটিও শুধরে নিতে ভুল করে না অটোপাইলট।

উড্ডয়ন-উচ্চতায় পৌঁছে ক্যাপ্টেন অটোপাইলটকে এই উচ্চতা বজায় রেখে চলার নির্দেশ দিয়ে দেন একটি লিভার ঘুরিয়ে। অটোপাইলট নির্দেশ মান্য করে স্টিকটা আস্তে একটু সামনের দিকে ঠেলে দেয়। বিমানের উঁচু থাকা নাক এখন নেমে সোজা হয়ে যায়। নির্দেশিত উড্ডয়ন-পথ বরাবর এগিয়ে যায় বিমান। এখন আর ইঞ্জিনের অত পাওয়ার না নিয়েই উচ্চবেগের ক্রুজিং গতি পাওয়া সম্ভব, তাই থ্রটলটাকেও খানিকটা টেনে নেয় অটোপাইলট। আবার স্টাবিলাইজারকে অল্পস্বল্প সারাক্ষণ ওঠানামা করাতে-করাতে বিমান এগোয় ভারসাম্যে সামান্য পরিবর্তনগুলোও শুধরে নিয়ে।

বিমানের ভেতর আর বাইরের আবহাওয়ায় এখন অনেক তফাত। বাইরের

বাতাস একেবারে পাতলা, সেখানে উত্তাপ সেলসিয়াসের শূন্য ডিগ্রির ৩০/৪০ ডিগ্রি নিচে। ভেতরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রেশারাইজড ক্যাবিনে বসে এসব বোঝার উপায় নেই। বাইরের পাতলা বাতাসের কারণে বিমানের নিয়ন্ত্রণগুলোকে যখন প্রয়োগ করতে হয়, একটু বেশিই করতে হয়, কারণ বাতাসের বাধা কম হওয়াতে এদের কার্যকারিতা এখন অপেক্ষাকৃত ধীর। একই কারণে ভারসাম্যও সহজে নষ্ট হয় না। কিন্তু একবার নষ্ট হলে ফিরিয়ে আনতেও বেগ বেশি পেতে হয়। নিয়ন্ত্রণ-দণ্ডগুলো এখন অপেক্ষাকৃত সহজে নাড়াচাড়া করা যায়, তাই নিজ হাতে করলে সাবধানে করতে হয় পাছে বেশি করা হয়ে যায়।

আমরা এখন পৃথিবীর মেঘ-আচ্ছাদনের বাইরে, অনেক উপরে। দিনের বেলায় রোদ-ঝলোমলো। নিচের দিকে মেঘের কারণে ভূমিতে কিছু না দেখতে পাওয়াটাই স্বাভাবিক। বিমানই এখন আমাদের পুরো জগৎ।

কোন কূল হতে কোন কূলে যাব

আমরা যাত্রীরা বিমানের ভেতরটাকেই আপাতত আমাদের পুরো জগৎ বলে মেনে নিলেও ক্যাপ্টেন আর তাঁর সহযোগীদের জন্য কিন্তু বিমানই একমাত্র জগৎ নয়। বাহ্যত তাঁর অবস্থাও আমাদের মতোই—মহাসমুদ্রের মাঝখানে জাহাজ-যাত্রীর মতো। কোনো ল্যান্ডমার্কও হয়তো দৃষ্টিগোচরে নেই, কিন্তু তাঁকে যেতে হবে সোজা গন্তব্যের দিকে—যে-গন্তব্যটি এই বিশাল বিশ্বে একটি শহর, একটি বিমানবন্দর, শেষ অবধি তাতে একটি রাস্তা—রানওয়ে। এক্ষেত্রে তাঁর ভরসা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বিমানের ভেতর ফ্লাইট-ডেকে তাঁর সামনে, আর বিমানের বাইরেও। শুধু যন্ত্র নয় তাঁকে যাত্রাপথ ঠিক রেখে চলতে সাহায্য করার জন্য অত্যন্ত কুশলী মানুষও আছেন—তাঁরা হলেন পথে-পথে বিভিন্ন স্টেশনে এয়ারট্রাফিক কন্ট্রোলাররা। কাজেই আমাদের ক্যাপ্টেন অকূলে অসহায় নন মোটেই।

আগেকার দিনে বড় যাত্রীবিমানে দু'জন পাইলট ও ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া একজন ন্যাভিগেটর বা পথসন্ধানীও থাকতেন। আজকাল ন্যাভিগেটরের প্রয়োজন হয় না। চালনার অধিকাংশ কাজ ক্যাপ্টেন করেন, অটোপাইলটে নজর রাখাসহ। পথসন্ধানী কাজগুলো কোপাইলটই করেন, কখনো-কখনো তিনি চালনার দায়িত্ব নিলেও। আসলে পথ-সন্ধানের কাজটি সত্যিকার অর্থে করেন ভূমিতে গ্রাউন্ড কন্ট্রোলার—নির্দেশ সেখান থেকেই আসে। কোপাইলট তাঁর সঙ্গে এবং ভূমিপথ-নির্দেশক যন্ত্রের সঙ্গে রেডিয়ো যোগাযোগ রাখেন এবং নির্দেশগুলো পালনের ব্যবস্থা করেন। যদিও ক্যাপ্টেন বিমানে সর্বেসর্বা এবং বিশেষ প্রয়োজনে কন্ট্রোলারের নির্দেশের বাইরেও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন—সেটি অতি বিরল ঘটনা। কার্যত এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সব নির্দেশ মেনেই বিমান চালাতে হয়।

আমরা ভূমিতে রাস্তা দেখি, নদীতে এবং বন্দরের কাছে সমুদ্রে বয়া ইত্যাদি দিয়ে জলপথ চিহ্নিত করতেও দেখি। কিন্তু কখনোই চিন্তা করি না আকাশেও ঐরকম আকাশপথ রয়েছে বিমান চলার জন্য। বিমান ইচ্ছামতো যেখান-সেখান দিয়ে চলতে পারে না, যদি চলত তা হলে বিমানে বিমানে সংঘর্ষের দুর্ঘটনা অহরহ ঘটত। বিমান-চলাচলের দায়িত্ব যাঁদের এসব আকাশপথের মানচিত্র তাঁরা ব্যবহার করেন। দুনিয়ার সব গুরুত্বপূর্ণ এয়ারপোর্টকে এসব আকাশপথ যুক্ত করছে। সাধারণত নিচে ৫০০০ ফুট উচ্চতা থেকে উপরে ২৫,০০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত দশ মাইল চওড়া এসব নির্দিষ্ট আকাশপথ বিস্তৃত থাকে। ঐ উচ্চতার উপরে গিয়ে পুরো আকাশটাই অনেকগুলো উড্ডয়নপথে বিভক্ত করা থাকে। প্রত্যেকটি ফ্লাইটের উড্ডয়নপথ সুনির্দিষ্ট করা থাকে—বামে, ডানে উচ্চতায়—কোনো দিক থেকেই এটি এ-পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। এভাবে নিজের জন্য নির্দিষ্ট পথে যাওয়ার কারণ হল সংঘর্ষ এড়ানো। এজন্য একই সঙ্গে একটি বিমানপথের একই অংশে একাধিক বিমান যেন না থাকে সে-ব্যবস্থা করা হয় অনেকটা রেলওয়ের ব্লক সিস্টেমের মতো। ব্লক সিস্টেমে একটি ট্রেন ঐ ব্লক ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত আর একটিকে রেলপথের ঐ ব্লকে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয় না। এখানেও তা-ই। আকাশে বিমান-ট্রাফিক যেভাবে দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে তাতে এসব সতর্কতা দিন-দিন অধিক প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে।

পাইলট ও গ্রাউন্ড কন্ট্রোলার সবার কাছে স্পষ্ট হবার জন্য বিমানপথগুলোকে চিহ্নিত করা হয় কীভাবে? এ-কাজ প্রধানত রেডিয়োতরঙ্গের। ৬০-৭০ মাইল দূরে-দূরে এ-পথে রেডিয়োতরঙ্গের বিকন থাকে, অনেকটা জাহাজের জন্য যেমন দৃশ্যআলোর বাতিঘর থাকে সেরকমের। পাইলট তাঁর যন্ত্রের সাহায্যে বুঝতে পারেন কখন তিনি একটি বিশেষ বিকন অতিক্রম করছেন। এই মুহূর্তটির সময়, বিমানের উচ্চতা ও পরবর্তী বিকন অতিক্রমের সম্ভাব্য সময় জেনে নিয়ে গ্রাউন্ড কন্ট্রোলার ঐ সময়ের জন্য অন্য কোনো বিমানকে এ-পথের পরবর্তী ব্লকে অর্থাৎ পরবর্তী বিকন পর্যন্ত অংশে ঢুকতে দেবেন না। অবশ্য একই অংশে ভিন্ন উচ্চতায় অন্য বিমান থাকতে পারবে—সাধারণত এক হাজার ফুট করে-করে বিভিন্ন উচ্চতায়। প্রথম বিমানটির ঠিক নিচের পথে যাওয়া বিমানটি হবে বিপরীতমুখী এক হাজার ফুট নিচে, তারও নিচেরটি হবে একই অভিমুখে প্রথম বিমানের দুই হাজার ফুট নিচে—এভাবে ব্যবধান রক্ষা করা হয়। এসব নির্দেশ গোড়াতেই ফ্লাইট প্ল্যানে নির্দিষ্ট করে দেয়া থাকে। তা ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাউন্ড কন্ট্রোলারগণ তাঁদের রাডারের পর্দায় প্রত্যেকটি বিমানকে আলাদা করে চিনতে ও চিহ্নিত করতে পারেন—বুঝতে পারেন এটি এখন কোথায় আছে, কী বেগে কোন দিকে এগোচ্ছে। এটি তাঁরা পারেন কারণ প্রত্যেক বিমানের সঙ্গে রয়েছে সুনির্দিষ্ট আত্মপরিচিতি বহনকারী ট্রান্সপন্ডার যন্ত্র, রাডারতরঙ্গ যেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে এ-সংবাদ নিয়ে যাচ্ছে।

পাইলটের কাছে যে-যে অ্যারোনটিকাল চার্ট থাকে তার থেকে তিনি বিভিন্ন বিকন স্টেশনগুলোর অবস্থান, ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদি জানতে পারেন। বিমানের মধ্যে ন্যাভিগেশন যন্ত্রের কাঁটা দেখে তিনি বুঝতে পারেন ঐ বিকনের দিকে তিনি এগুচ্ছেন কি না, অথবা ঐ বিকনকে ঠিক পিছনে রেখে একে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন কি না। সেটি যদি না হয়, তা হলে তিনি পথবিচ্যুত আছেন, এবং নিজের গতিপথ তাঁকে ঠিক করে নিতে হবে। এ-সংক্রান্ত বহুল ব্যবহৃত সিস্টেমটিকে বলা হয় VOR (Very high frequency Omnidirectional Radio) অর্থাৎ সর্বদিকসঞ্চারী অতিউচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি রেডিয়ো। পাইলট নিজে অথবা অটোপাইলট এগুলোর সংকেত অনুযায়ী নিজের গতিপথ ঠিক করে নিতে পারেন।

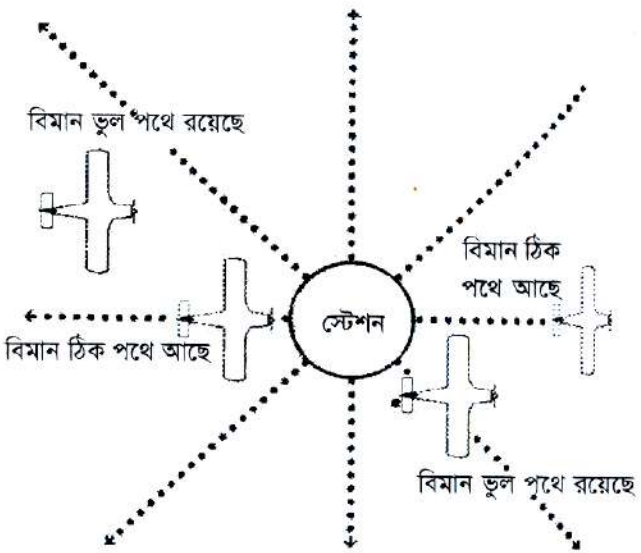

বিমানের পথপ্রদর্শনে জন্য VOR স্টেশনের রেডিয়ো বিকন

তা ছাড়া আজকাল GPS (Global Positioning System) বা বিশ্বঅবস্থান নির্ণায়কের দ্বারা যে-কেউ পুরো পৃথিবীর যে-কোনো স্থানে নিজের অবস্থান দশ-বিশ মিটার পর্যন্ত নির্ভুলতায় নির্ণয় করতে পারে। বিমান তার আকাশপথ থেকে একটু এদিক-ওদিক গেলেই সেটি ধরা পড়বে। বেশকিছু কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে সিগন্যাল সমন্বিত করেই এটা করা সম্ভব হয়। ফলে আকাশেও পথ হারানো এখন প্রায় অসম্ভব

কাজ—এমনকি সেটি মহাসমুদ্রের মাঝখানে আকাশে যেখানে কোনো স্থানীয় বিকন নেই সেখানে হলেও। কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাব-নিকাশ করে অথবা দূরবর্তী লং রেঞ্জ ন্যাভিগেশনাল (লোর‍্যান) সংকেত নিয়ে সমুদ্র-পাড়ি-দেয়া বিমানের দিকনির্দেশনা ব্যবস্থা বহুদিন থেকেই চালু রয়েছে। আর এখন তো GPS-ই রয়েছে।

এটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে আকাশে যেখানেই আপাতদৃষ্টিতে যত একাকীই ক্যাপ্টেন এবং তাঁর ক্রু ও যাত্রীরা থাকুন-না কেন, তিনি কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন নন। আর তিনি যেমন খুশি তেমন চলার মতো স্বাধীনও নন। তাঁকে চালিয়ে যাবার জন্য রয়েছে বিশ্বজোড়া এক বিস্তারিত আয়োজন। সেখানে একটি বড় ব্যক্তিগত ভূমিকা পালন করছেন প্রত্যেক গ্রাউন্ড কন্ট্রোলার—যাত্রাপথের নানা স্থানে, বিশেষ করে বড় এয়ারপোর্টগুলোতে কন্ট্রোলারের সঙ্গে আলাপী যোগাযোগ রক্ষা করেই তাঁকে চলতে হয়। আর বিশ্বজনীনতার প্রয়োজনে সে-আলাপের ভাষা সর্বত্র সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে—সেটি ইংরেজি, যাতে ভাষাগত কারণে কোনো ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে মারাত্মক পরিণতির শিকার না হতে হয়। যে-দেশের নাগরিকই হই-না কেন, নিজেরা যেই ভাষীই হই-না কেন, বিমান পরিচালনার কাজে থাকতে হলে—পাইলট বা গ্রাউন্ড কন্ট্রোলার যে-কেউ, ইংরেজিতেই আমাকে যোগাযোগ রাখতে হবে।

যখন যন্ত্র-পাঠই ভরসা

অভিজ্ঞ পাইলট শুধু তাঁর সামনের নানা নির্দেশক যন্ত্র পাঠ করেই বিমান চালাতে পারেন—দূরের দিগন্তরেখা, নিচের ভূমি কিছুই দেখতে না পেয়েও। এ-কারণেই মেঘ, কুয়াশা, ভারী বৃষ্টি এর মধ্যেও তিনি বিমানকে চালনা করতে পারেন, এমনকি

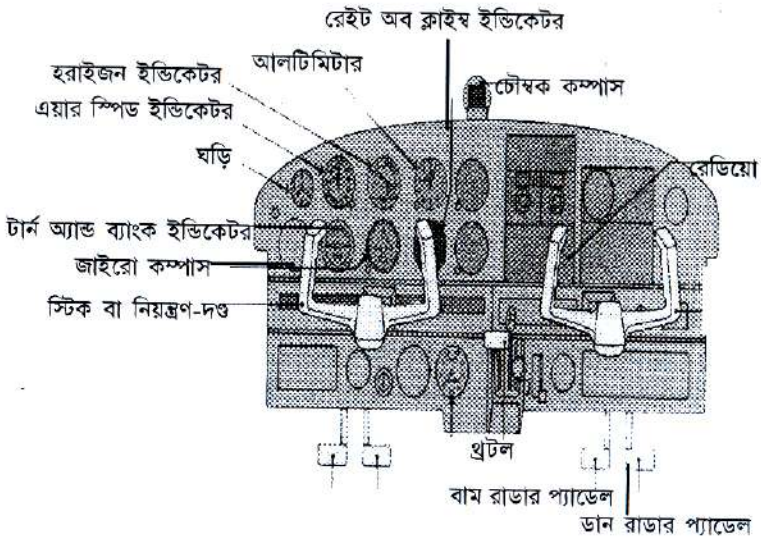

পাইলট ও কোপাইলটের সামনে যন্ত্রপাতি ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা
(আপেক্ষাকৃত ছোট বিমানে)

সম্পূর্ণ যন্ত্রনির্ভর হয়ে ল্যান্ডও করাতে পারেন। এসব নির্দেশকের মধ্যে একেবারে জরুরি হল গতিমাপক এয়ার স্পিড ইন্ডিকেটর, দিগন্তরেখার আপেক্ষিকে বিমানের ভঙ্গিমাটি জানার জন্য হরাইজন ইন্ডিকেটর, উচ্চতামাপক যন্ত্র আলটিমিটার, উচ্চতায় আরোহণের হার-নির্দেশক যন্ত্র, ঘড়ি, চৌম্বক কম্পাস, জাইরো কম্পাস ইত্যাদি। আর কিছু যন্ত্র আছে যেগুলো ইঞ্জিনের বিভিন্ন দিকের অবস্থা নির্দেশ করে। অন্য আর একদল যন্ত্র হচ্ছে ন্যাভিগেশন-সম্পর্কীয় এবং বিমানের অন্যান্য নানা সিস্টেম সম্পর্কে অবহিত রাখতে।

এয়ার স্পিড ইন্ডিকেটর

বিশেষ কিছু জটিলতা দেখা দেয় বিমানের গতিবেগ মাপার ক্ষেত্রে। পাইলটের সামনের যন্ত্র যা নির্দেশ করে সেটি হল বিমানের অপেক্ষিকে বায়ুপ্রবাহের গতি (এয়ার স্পিড)। এটি বিমানের বেগ বুঝতে দেয় বটে, কিন্তু ভূমির আপেক্ষিকে বিমানের অগ্রগতির সত্যিকার যে-বেগ তার সঙ্গে এর খানিকটা পার্থক্য হতে পারে স্থানীয় আবহাওয়ায় বায়ুপ্রবাহের নিজস্ব গতির কারণে।

এয়ার স্পিড মাপার জন্য বিমানের বাইরে এক বা একাধিক ছোট টিউব বসানো থাকে যেটা আসলে তার উপর ধাক্কা দিয়ে আসা বাতাসের চাপটি মাপে। এই চাপের সঙ্গে বাইরের স্থির বাতাসের সাধারণ চাপের তুলনা করেই বিমানের উপর প্রবহমান বাতাসের বেগ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন উচ্চতায় ওড়ার সময় ও বিভিন্ন তাপমাত্রায় স্থির বায়ুচাপের পার্থক্যের কারণে এয়ার স্পিড ইনডিকেটর কম বা বেশি গতিবেগ দেখাবে। সাধারণত প্রতি এক হাজার ফুট উচ্চতার জন্য পাইলটকে প্রদর্শিত এয়ার স্পিডের সঙ্গে শতকরা দুই ভাগ আরো বাড়িয়ে নিয়ে বিমানের আসল এয়ার স্পিড হিসাব করে নিতে হয়। অর্থাৎ দশ হাজার ফুট উপর দিয়ে চলার সময় নির্দেশক যন্ত্র যদি বলে বিমানের উপর বায়ুপ্রবাহের বেগ ঘণ্টায় ৩০০ মাইল তা হলে আসল বায়ুপ্রবাহ বেগ হবে ঘণ্টায় ৩৬০ মাইল। এরপর ভূমির আপেক্ষিকে বিমানের সত্যিকার গতি যদি মাপতে হয় তা হলে বাতাসের নিজস্ব প্রবাহের দিক ও বেগ জানতে হবে। যদি উল্লিখিত বিমানের চলার বিপরীত অভিমুখে বাতাসের নিজস্ব আবহাওয়াজনিত প্রবাহের বেগ হয় ঘণ্টায় ৩০ মাইল, তা হলে বিমানের সত্যিকারের গতিবেগ হবে ৩৩০ মাইল। অর্থাৎ ৩৬০ মাইল এয়ার স্পিডের জন্য 'গ্রাউন্ড স্পিড' হবে ৩৩০ মাইল।

হরাইজন ইন্ডিকেটর (কৃত্রিম দিগন্ত)

এতে নির্দেশক ডায়ালে একটি রেখা দিগন্তরেখার প্রতিনিধিত্ব করে। জাইরোস্কোপ

যন্ত্রের সহায়তায় এখানে বিমানের একটি প্রতীক এই রেখাটির আপেক্ষিকে কোথায় রয়েছে তা দেখে বিমান কী ভঙ্গিতে এগুচ্ছে— ঊর্ধ্বগামী, নিম্নগামী, না ভূমি সমান্তরালে রয়েছে তা নির্দেশ করে। কতখানি কোণ করে উঠছে বা নামছে তাও বোঝা যায়। একই সঙ্গে ডানে-বামে কাত হয়েছে কি না, হলে কতখানি তাও ধরা পড়ে।

ডেভিয়েশন ইন্ডিকেটর (বিচ্যুতি-নির্দেশক)

নির্দিষ্ট গতিপথের থেকে বিমান বিচ্যুত হয়েছে কি না এবং হলে কতখানি বিচ্যুত হয়েছে তা এর থেকে বোঝা যায়। এতে বিমানের জন্য নির্দিষ্ট গতিপথটি দেখানো হয়। আর একটি কম্পাসের সাহায্যে বিমানের প্রকৃত গতিপথটিও দেখানো হয়। এই দুয়ের আপেক্ষিক অবস্থানই বিচ্যুতি বলে দেয়। অনেক সময় এই একই নির্দেশকে দূরত্বমাপক ব্যবস্থাটি থাকে যেটি এ-পর্যন্ত এ-ফ্লাইটে বিমান কত দূরত্ব অতিক্রম করেছে তা বলে দেয়—অনেকটা মোটরগাড়ির মাইলেজের মতো।

আলটিমিটার (উচ্চতা-নির্দেশক)

সাধারণত উচ্চতা নির্দেশ করা হয় স্থির বায়ুচাপ মাপার মাধ্যমে। উচ্চতার সঙ্গে-সঙ্গে নির্দিষ্ট হারে বায়ুচাপ কমে। এগুলো ব্যারোমেট্রিক আলটিমিটার। এরা সমুদ্র-সমতল থেকে অথবা এয়ারপোর্টের সমতল থেকে কত উচ্চতা হল তা-ই মাপে। আর একধরনের আলটিমিটার রয়েছে রেডিয়ো আলটিমিটার। এটি রেডিয়োতরঙ্গ নিচে পাঠিয়ে দেয় আর ওটা ভূমিতে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে কত সময় লাগল তা মাপে আর সেখান থেকেই উচ্চতা বুঝতে পারে। এটি প্রতি মুহূর্তে বিমানের নিচের ভূমি থেকে তার উচ্চতা মাপছে—পর্বতচূড়া ইত্যাদি থেকে ব্যবধান মাপতে এটিই বেশি সুবিধাজনক।

রেইট অব ক্লাইম্ব ইন্ডিকেটর (আরোহণ-হার নির্দেশক)

প্রতি মিনিটে বিমান কত ফুট হারে উঠছে বা নামছে সেটি বোঝার জন্য এই নির্দেশক প্রয়োজন। নির্দেশকটির কাঁটা শূন্যতে থাকলে বোঝা যায় বিমান ভূমি-সমান্তরালে অর্থাৎ লেভেল ফ্লাইং করছে। ধরা যাক কাঁটা উপরের দিকে ০.৫ দেখাচ্ছে—তার মানে বিমান মিনিটে ৫০০ ফুট করে উঠছে। অথবা নিচের দিকে ১.০ দেখাচ্ছে—তার মানে বিমান মিনিটে ১০০০ ফুট হারে নেমে যাচ্ছে।

টার্ন অ্যান্ড ব্যাংক ইন্ডিকেটর (ঘোরা ও কাত হওয়া-নির্দেশক)

এর দ্বারা বোঝা যায় বিমান ডানে বা বামে ঘুরছে কি না এবং কী হারে ঘুরছে। এর কাঁটা ডানে বা বামে কতটা হেলল সেটি দেখেই এটি বোঝা যায়। সেসঙ্গে আর একটি

নির্দেশক ফোঁটা যদি মাঝামাঝি থাকে তা হলে বুঝতে হবে ঘোরার সময় বিমান যেভাবে যতখানি কাত হয়েছে সেটি সঠিক—যার ফলে ঘোরাটা মসৃণভাবে হতে পারবে। যদি ফোঁটাটি ঘোরার দিকের বিপরীত দিকে সরে থাকে—তা হলে বুঝতে

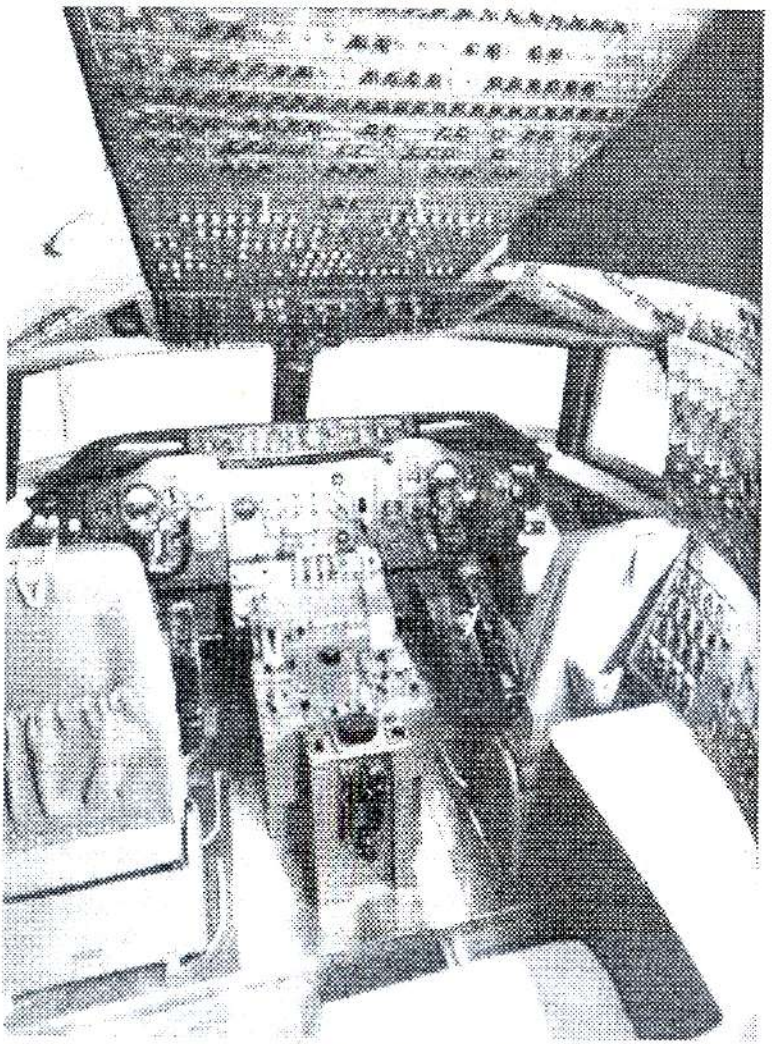

বড় যাত্রীবাহী বিমানে ফ্লাইট-ডেক

হবে কাত হওয়াটা কম হয়েছে ও বিমান স্কিড করে ঘোরার বৃত্তের বাইরের দিকে সরে যেতে চাইছে। আর যদি ফোঁটাটি ঘোরার দিকেই সরে থাকে তা হলে বুঝতে হবে কাত বেশি হয়ে গেছে, বিমান স্লিপ করে বেশি দ্রুত ঘুরে যেতে চাইছে।

ইঞ্জিনসংক্রান্ত নির্দেশকসমূহ

পাইলট আর কোপাইলটের মাঝামাঝি জায়গায় দুজনেই দেখতে পাওয়ার মতো করে থাকে ইঞ্জিনের নানা খবর নিয়ে নানা নির্দেশক। এতে এক-একটি ইঞ্জিনের উত্তাপ, জালানি-ব্যয়, লুব্রিকেন্ট অয়েলের অবস্থা ইত্যাদি জানা যায়।

বিমানের সিস্টেমসংক্রান্ত নির্দেশকসমূহ

বড় বিমানগুলোতে পাইলটদের ডান হাতের দিকে এবং পেছনে বড়-বড় প্যানেলে এরকম অনেক নির্দেশক থাকে। বিমানের যতরকম যান্ত্রিক কাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ—ইলেক্ট্রিক্যাল সিস্টেম, হাইড্রলিক সিস্টেম, ফুয়েল সিস্টেম, এয়ারকন্ডিশনিং, অভ্যন্তরীণ প্রেশারাইজেশন ইত্যাদি সবকিছুর যথাযথ সম্পাদনের উপর নজর রাখার জন্যই এসব নির্দেশক।

এখন এসেছে স্ক্রিন

আধুনিকতম যাত্রী-বিমানগুলোতে পরিচিত ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলটি আর থাকছেনা। তার বদলে সেখানে দেখা দিচ্ছে কম্পিউটার মনিটর স্ক্রিন। বিভিন্ন যন্ত্র যেসব তথ্য তার মিটারের ডায়াল ইত্যাদি থেকে দিত, এখন তার সবই পাওয়া যাচ্ছে ঐ স্ক্রিনে, কম্পিউটারের আউটপুট হিসাবে একটু ভিন্নভাবে। এতে দক্ষতা বাড়ছে, আরো নিখুঁত তথ্য পাইলটের কাছে আরো সহজ-দৃশ্য, সহজবোধ্যভাবে ফুটে উঠছে। তা ছাড়া থাকছে এর বৈচিত্র্য। একই স্ক্রিনে প্রয়োজন মতো বহুরকমের তথ্য বিশদভাবে আনা যাচ্ছে সুস্পষ্ট ভঙ্গীতে-যা আগে সম্ভব ছিলনা। মনিটর স্ক্রিনের কথা ভেবে একে বলা হচ্ছে ফ্লাইং বাই গ্লাস—অর্থাৎ কিনা ভবিষ্যতে কাঁচ পাঠই হবে ভরসা।

আবহাওয়ার হাওয়া বুঝে চলা

বিমানের পাইলটকে আগাগোড়া পথে আবহাওয়ার খুঁটিনাটি জানতে হয় আর সেইভাবে চলতে হয়। সেজন্য যাত্রা-শুরুতেই তিনি পথের আবহাওয়া তথ্য ও চার্ট সংগ্রহ করে নেন। তারপর যাত্রাপথে নিয়মিতভাবে রেডিয়ো-যোগাযোগে খোঁজখবর রাখেন সর্বশেষ পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে। বিশেষ করে অতিরিক্ত খারাপ আবহাওয়া আর ঝড় থেকে বিমানকে সতর্কতার সঙ্গে বাঁচিয়ে চলতে হয়। অবশ্য এগুলো সবচেয়ে বেশি যেখানে সেই নিম্ন-উচ্চতায় আজকাল বড় বিমানগুলোকে বেশিক্ষণ থাকতে হয় না। প্রেশারাইজড ক্যাবিন সম্ভব হবার পর থেকে বিমান ওঠা ও নামার সময়টি ছাড়া বাকি সময় এসব ঝড়-তুফানের উপর দিয়েই চলতে পারছে। কিন্তু সেই ঊর্ধ্ব-উচ্চতায়ও এটি আবহাওয়ার খেয়ালখুশি থেকে একেবারে মুক্ত নয়।

বায়ুপ্রবাহ

আবহাওয়ার যে-বিষয়টি পাইলটকে প্রতি মুহূর্তেই ধর্তব্যে আনতে হয় তা হল বায়ুপ্রবাহ। সাধারণ স্বাভাবিক বায়ুপ্রবাহগুলোর জন্য চার্ট রয়েছে এবং সেগুলো পাইলট ব্যবহার করেন। চার্ট আরো দেয়া থাকে কোন-কোন জায়গায় তুষার, কুয়াশা, বায়ুপ্রবাহের হঠাৎ-বিকৃতি ইত্যাদি বেশি আশঙ্কা করা যায়। বায়ুপ্রবাহের দিক ও বেগের উপর নির্ভর করে বিমানের সত্যিকার গতিবেগ কত হবে, গন্তব্যে যেতে তার কতক্ষণ লাগবে—অনুকূল বায়ু, প্রতিকূল বায়ুর বিষয়টি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এদিক থেকে সবচেয়ে বেশি খেয়াল করতে হয় ঊর্ধ্বাকাশের শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহ জেটস্ট্রিমগুলোকে। পঁচিশ হাজার ফুট থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট উপরে থাকা এই বায়ুপ্রবাহগুলো জেট-চলাচলের এলাকাতে রয়েছে বলেই এই নাম। তাদের অধিকাংশই

পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহিত হয় এবং কোনো-কোনোটি ঘণ্টায় ৩৭৫ মাইল বেগে বইতেও দেখা গেছে।

কম উচ্চতায় ওড়ার সময় বায়ুপ্রবাহের এই অস্বাভাবিক বেগটি সাধারণত অতিরিক্ত হয় না—ঝোড়ো হাওয়ায় না পড়লে। ভূমি উত্তপ্ত হওয়ার কারণে ঊর্ধ্বমুখি বাতাস এবং পাহাড়-পর্বত, সমুদ্রতটরেখার মিলন ইত্যাদি নানা পরিস্থিতির কারণে নিচের দিকে অবশ্য ঝোড়ো হাওয়ার কমতি থাকে না। ঝোড়ো হাওয়াতে বিমানের ভারসাম্য রাখা কঠিন হয়, প্রচুর উথালপাথাল অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে, যাত্রীদের জন্যও ভীতিপ্রদ অবস্থা সৃষ্টি করে।

মেঘ ও বজ্রঝড়

পাইলটকে যাত্রাপথে বিভিন্নরকম মেঘ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। উপরে ওঠার সময় মেঘের তলায় বা মেঘের মধ্য দিয়ে চলার সময় বিমানে অল্পবিস্তর কিছু কাঁপুনি হওয়া স্বাভাবিক। মেঘের উপর উঠে যাওয়ার পর এটি থাকে না। তবে এর মধ্যে কিউমুলো নিম্বাস বা বজ্রমেঘ থেকে বিশেষভাবে সাবধান থাকতে হয়। এই মেঘগুলো বেশ নিচু-উচ্চতা থেকে উপরের দিকে ফেঁপে-ফুলে অনেক উচ্চতা পর্যন্ত উঠে যায়। এই মেঘই বজ্রঝড়ের জন্য দায়ী। এই মেঘের মধ্যে বায়ু ঘণ্টায় ১০০ মাইলেরও বেশি বেগে ঊর্ধ্বগামী হতে পারে—এবং তা বিমানের চালনায় ভয়াবহ হতে পারে। এটিই বিপজ্জনক ; বজ্র-বিদ্যুৎ নিজে বিমানের রেডিয়ো-যোগাযোগব্যবস্থার গুরুতর বিঘ্ন ঘটালেও বিমানের গায়ে বিদ্যুৎপাত ভয়প্রদায়ী হওয়া ছাড়া সাধারণত অন্য কোনো মারাত্মক ক্ষতি করে না। বজ্রঝড়ের জন্য বজ্রমেঘকে এড়িয়ে চলাটাই পাইলটের কর্তব্য। এটি এত উঁচু যে এর উপরে উঠে যাওয়ার চেষ্টা না করে বরং এর থেকে যত দূর দিয়ে যাওয়া যায়, ততই মঙ্গল।

পাহাড়ি ঝড়

পাহাড়-পর্বতের ঢালের উপর দিয়ে যাওয়ার সময়ও কিছু বাড়তি সাবধানতা নিতে হয়, কারণ এখানে বাতাস ঢালের বাধা পেয়ে দ্রুততর হয়ে উপরে ওঠে এবং চূড়ায় গিয়ে নিচের দিকে আছড়ে পড়ে—যেসব কারণে এখানে বাতাসের একধরনের উত্তাল তরঙ্গে ভেঙে পড়ার প্রবণতা রয়েছে যা বিমানের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে।

CAT

যে-উচ্চতায় জেটবিমান ওড়ে, সেখানেও একধরনের উত্তাল বায়ু একে আক্রান্ত করতে পারে—ঝড়ের অন্য কোনো আলামত ছাড়াই। বজ্র, বৃষ্টি, তুষার কোনোকিছুই না থেকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার আবহাওয়াতেই উঠতে পারে এই ঝড়—এজন্য একে বলা হয়

ক্লিয়ার এয়ার টারবুলেন্স (CAT) অর্থাৎ পরিষ্কার বাতাসের উত্তালতা। উর্ধ্বাকাশে জেট স্ট্রিমে দুই ভিন্ন তাপমাত্রার যোগাযোগের ফলেই খুব সম্ভব CAT-এর সৃষ্টি হয়।

তুষার

শীতপ্রধান দেশে স্বল্পগতির প্রপেলার বিমানগুলোর জন্য বিমানের ডানায় ও প্রপেলারে বরফ জমে যাওয়াটা একটি বড়রকমের বিপদ হতে পারে। সেজন্য প্রপেলারের উপর অ্যালকোহল ছড়িয়ে তুষারকে দূরে রাখা হয়। ডানার অগ্রবর্তী কিনারায় রাবার টিউব ক্রমাগত ফুলিয়ে ও চুপসিয়ে তার টানাপড়েনে জমা বরফ গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। বেশ উচ্চতায় উঠে যাওয়ার পর ঠাণ্ডা জলীয় বাষ্পহীন পাতলা বাতাসে বরফ জমার ভয় ততটা থাকে না। জেটের উচ্চগতির কারণে বাতাসের ঘর্ষণ বিমানের গা গরম রাখে, জেটের গরম হাওয়াকেও এ-কাজে ব্যবহার করা যায়—যে-কারণে তুষার জমার সম্ভাবনা থাকে না। আর অধিক উচ্চতা ও ঠাণ্ডা শুষ্ক বাতাসের ব্যাপারটি তো জেটবিমানের উচ্চতায় আরো বেশি প্রযোজ্য।

কুয়াশা ইত্যাদি

ঘন কুয়াশা, প্রবল বর্ষণ আর কোনো-কোনো অঞ্চলে ঘন ধূলিঝড় পাইলটের দৃষ্টিসীমা কমিয়ে ফেলে বিমান-চলাচলে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, বিশেষ করে ল্যান্ডিং ও টেইকঅফের সময়। উচ্চমানের যান্ত্রিক ব্যবস্থা যেসব এয়ারপোর্টে নেই সেখানে সাধারণত এরকম আবহাওয়ায় বিমান ওঠানামা বন্ধ থাকে। অধিক্ষণ স্থায়ী হলে আগত বিমানকে অন্য এয়ারপোর্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

টারবুলেন্স

দীর্ঘ বিমানযাত্রায় হয়তো বেশ কয়েকবার ক্যাপ্টেন হঠাৎ করে সবাইকে সিটবেল্ট বেঁধে বসে থাকতে বলবেন—বিমান টারবুলেন্স-এলাকার অর্থাৎ ঝোড়ো অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছে বলে। এর কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো অনুভব করব বিমানের ঝাঁকুনি, যেটি পরিণত হতে পারে বিমানের বড়রকমের উথালপাথালে—যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিছুক্ষণ মৃদু ঝাঁকুনির মধ্যে থাকার পর এর অবসান ঘটে।

অতি বিরল ক্ষেত্রে বড়রকম ঝড়ের মধ্যে পড়ে গেলে অবশ্য টারবুলেন্স বেশ ভীতিপ্রদ হতে পারে। এ-সময় ডানা কিছুটা ঝাপটাতে থাকে, বিমান ক্ষণে বেশ খানিকটা নেমে যাচ্ছে আবার ক্ষণে উঠে যাচ্ছে এমন হতে পারে—শরীরে এর অনুভূতি বেশ অস্বস্তিকর হতে পারে। অনিয়ন্ত্রিতভাবে ইয়, পিচ বা রোল হচ্ছে তাও দেখা যায় এবং অনুভূত হয়। যদিও আগেভাগে জানতে পারলে পাইলট এরকম ঝড় এড়িয়ে

যাবেন, অনেক সময় হঠাৎ করে এমন ঝড়ের উদ্ভব হতে পারে যা এড়ানো সম্ভব হয় না।

যতই ভীতিপ্রদ হোক-না কেন, ঝড় যতই প্রবল হোক-না কেন, বিমানের অবয়ব ও যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত না হলে, এবং বিপজ্জনকভাবে ভারসাম্য ও উচ্চতা না হারালে বড় টারবুলেন্সকেও ভয় করার কিছু নাই। আর আধুনিক বড় বিমানগুলো বড় ঝড়েও অক্ষত থাকার মতো করেই তৈরি, ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যও ব্যবস্থাদি এতে প্রচুর রয়েছে।

প্রচণ্ডতম টারবুলেন্সেও আধুনিক বড় যাত্রীবাহী বিমানগুলো ভেঙে পড়ার বা ভৌত ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এর কারণ বিমান ডিজাইন করার সময় এবং চূড়ান্ত উৎপাদন শুরুর আগে পরীক্ষানিরীক্ষার সময় দীর্ঘ দিন ধরে এর উপর সম্ভব-অসম্ভব সবরকম ঝড়ঝাপটা কৃত্রিমভাবে প্রয়োগ করে এসবের বিরুদ্ধে এর টেকসই হওয়াটা নিশ্চিত করা হয়। যেমন ডানা দুটিকে দুদিকে অসম্ভব রকম মুচড়িয়ে দেখা হয় যে এর ভেঙে পড়তে কী প্রচণ্ডরকম এবং ঠিক কতখানি শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ সাম্প্রতিকতম কালে বোয়িং-৭৭৭ উৎপাদন শুরুর আগে এর পূর্ণ-মাপের মডেলকে পূর্ণ ওজনে লোডিং করে পুরো দুই বছর ধরে নিয়মিত এর উপর সবরকম অত্যাচার করা হয়েছে, সম্ভাব্য সকল আবহাওয়ার এবং টারবুলেন্সের পীড়ন সহ্যক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য।

পাইলট বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রয়োগের মাধ্যমে ঝড়ের সময়ও যথাসম্ভব ভারসাম্যে থাকার চেষ্টা করেন। সাধারণত তিনি অটোপাইলটের হাত থেকে নিজে এ-সময় নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন। এ-সময় বিমানের গতিবেগ কমিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হয় ; অযথা ঝড়ের একেবারে বিপক্ষে গিয়ে গতি আর উচ্চতা বজায় রাখার চেষ্টা না করাই ভালো, অটোপাইলট যেটি করতে চাইবে। প্রয়োজনে এয়ারব্রেইক প্রয়োগ করে দ্রুত বেগ কমিয়ে আনা হবে। তুষার জমার সম্ভাবনা দেখা দিলে বরফ গলাবার ব্যবস্থা করতে হয়—বিশেষ করে ইঞ্জিনের সামনে থেকে। পাইলট যথাসাধ্য চেষ্টা করেন বিমানকে সোজা রাখতে এবং মোটামুটি সমতল ভঙ্গিতে রাখতে। ওদিকে ক্যাবিনের মধ্যে যাত্রীদের সিটবেল্ট বেঁধে রাখাটা খুব জরুরি, কারণ আহত হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি বিমানের মধ্যে ছিটকে গিয়ে ছাদে সজোরে ধাক্কা লেগে মাথা ফেটে গিয়ে—অন্য কোনো কারণে নয়। ক্যাবিনের মধ্যে কোথাও আলগাভাবে মালপত্র যেন না থাকে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হয় টারবুলেন্সের সময়। প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় শেষ পর্যন্ত টারবুলেন্স কেটে গেছে স্থায়ী কোনো ক্ষতি না করে। যাত্রীরা তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। একসময় সিটবেল্ট বাঁধার সংকেতটিও নিভিয়ে দেয়া হয়, যাত্রীরা যে যা করছিলেন তা-ই আবার করতে লেগে যান।

নিরাপদ, তবুও প্রস্তুত

বিমানভ্রমণকে সর্বতোভাবে নিরাপদ করার জন্য অভাবনীয় সব অগ্রগতি হয়েছে, এবং দিন-দিন আরো হচ্ছে। এর ফলে বিমানভ্রমণ এখন অন্য যে-কোনো ভ্রমণের চেয়ে বেশি বৈ কম নিরাপদ নয়। তবে আকাশে বিমানে ওড়ার কালে আপাতদৃষ্টিতে এর বেশকিছু অসহায়ত্ব থাকে বলে এই ভ্রমণকে তুলনামূলকভাবে নাজুক মনে করার প্রবণতা রয়েছে। বিমান দুর্ঘটনাগুলোও মানুষের মনে রেখাপাত করে অপেক্ষাকৃত বেশি। কিন্তু আসলে আজকাল দুনিয়াজুড়ে যে অসংখ্য ফ্লাইট প্রতি মুহূর্তে চলাচল করছে তাদের অনেকগুলোই দশ-বারো ঘণ্টার উপর একটানা—সে-তুলনায় দুর্ঘটনার সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। তা সত্ত্বেও বিমানের প্রতিটি ফ্লাইটই সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকে যে-কোনো দুর্ঘটনার মোকাবেলা করতে এবং তার জন্য প্রত্যেক যাত্রীকেও প্রস্তুত রাখার চেষ্টা করা হয়। তাই যাত্রার শুরুতেই জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে বা দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে কী কী করতে হবে তা সবকিছু প্রদর্শন করে ভালোমতো বুঝিয়ে দেয়া হয়। আর সবার সামনে করণীয়গুলো সচিত্র মুদ্রিত পুস্তিকার আকারে পড়ার জন্য দিয়েও দেয়া হয়।

অক্সিজেন, সিটবেল্ট

দুর্ঘটনার কারণে ঊর্ধ্বাকাশে ক্যাবিনের প্রেশারাইজেশন বিকল হয়ে পড়তে পারে—অর্থাৎ ক্যাবিনে বায়ুচাপ বাইরের মতো মাত্রায় নেমে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকে যেন নিশ্বাসে অক্সিজেন নিতে পারে এজন্য সবার সামনেই অক্সিজেন মাস্ক নেমে আসে—যা নাকমুখের উপর ফিট করে নিতে হয় সঙ্গে-সঙ্গে। এ-ব্যবস্থার মধ্যে

থেকে হয় প্রেশারাইজেশন পুনঃস্থাপিত করা সম্ভব হয় নইলে পাইলট বিমানকে দ্রুত নিম্ন-উচ্চতায় ঘন বাতাসের অঞ্চলে নামিয়ে আনতে পারেন। উড্ডয়নকালীন টারবুলেন্সে সিটবেল্ট বেঁধে নিজকে আটকিয়ে রেখে আহত হবার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হয়। ওড়ার সময় বিমানের ভেতরে বা বাইরে কোথাও আগুন ধরে গেলে অগ্নিনির্বাপক প্রয়োগ করে তা সঙ্গে সঙ্গে নেভাবার ব্যবস্থা থাকে।

জরুরি অবতরণ

সবচেয়ে বিপদের আশঙ্কা বেশি হল যদি বিমানকে ইমারজেন্সি ল্যান্ডিং বা জরুরি অবতরণ করতে হয়। বাধ্য হয়ে স্বাভাবিকভাবে ল্যান্ডিং না করতে পারলে পরিস্থিতি অনুযায়ী বহু অঘটন ঘটতে পারে। ক্ষয়ক্ষতি নির্ভর করবে এরকম ল্যান্ডিং-এর সময় বিমান পাইলটের কতটুকু নিয়ন্ত্রণে ছিল তার উপর। ল্যান্ডিং গিয়ার বা চাকা নামাতে না পারলে সোজা বিমানের পেটের উপর নামতে হতে পারে। রানওয়েতে অনিয়ন্ত্রিতভাবে নামতে হতে পারে। রানওয়ে নয়, অন্য কোনো খোলা জায়গায় নামতে হতে পারে, সমুদ্রের পানিতেও নামতে হতে পারে। যেখানেই হোক জরুরি অবতরণের সময় যাত্রী সব চোখা জিনিস (কলম কিংবা হাইহিল জুতাসহ) সরিয়ে ফেলবেন, মাথা হাঁটুর উপর এনে হাত মাথায় রেখে ব্রেইস পজিশনে যাবেন। মাথার উপরে বালিশ ইত্যাদি নরম কিছু দেবেন আঘাত থেকে বাঁচার জন্য। পা কোনোকিছুর নিচে না রাখার চেষ্টা করবেন, যেখানে এটা আটকে যেতে পারে। তারপর বিমান যেভাবেই হোক, যত ঘাত-প্রতিঘাতের পরই হোক দাঁড়িয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে সুশৃঙ্খলভাবে মাথা ঠাণ্ডা রেখে যত দ্রুত সম্ভব সবচাইতে কাছের দরজা দিয়ে বিমান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। জরুরি অবতরণে আঘাতে ও ঘর্ষণে জ্বালানি ও দাহ্য পদার্থপূর্ণ এই বিমানে আগুন ধরে যাওয়া এমনকি বিস্ফোরণ ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। ইতোমধ্যেই বিমান আগুনে ধোঁয়ায় ভরে গেলে দরজার দিকে যাওয়ার সময় যথাসম্ভব নিচু হয়ে যেতে হবে কারণ নিচে ধোঁয়া কম থাকে। সবচেয়ে বেশি বিপদের আশঙ্কা আগুন, বিস্ফোরণ আর ধোঁয়া থেকে। এক্ষেত্রে বেরুতে পারার সময়টি অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল— এটাই বাঁচা-মরার মধ্যে পার্থক্য। সামান্য দেরি হলে আগুন-বিস্ফোরণ ছাড়াও বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটি খুব বেশি থাকে।

দ্রুত বেরুবার সুযোগ বেশি হয় যদি নিকটবর্তী দরজাগুলোর অবস্থান আগে থেকে জানা থাকে। সাধারণ দরজাগুলো ছাড়াও বিমানের আকারভেদে বেশকিছু আপৎকালীন দরজা থাকে যেগুলো ভালোভাবে চিহ্নিত করা থাকে। উড্ডয়নের আগে সতর্কতামূলক বক্তব্যের সময় এই দরজাগুলো দেখিয়ে দেয়া হয়। প্রত্যেকের দেখে রাখা উচিত। জরুরি অবতরণের সময় ক্যাবিনের আগাগোড়া লাল আলোর সংকেত

দরজাগুলোর পথ অঙ্কিত করে দেয়া হয়। যাত্রীকে হয়তো এ-সময় এ-দরজা নিজেকেই খোলার ব্যবস্থা করতে হবে, তাই আগে থেকে খোলার পদ্ধতি সামনে-রাখা পুস্তিকা থেকে জেনে রাখা ভালো—যাতে এটিই একটি বড় বাধা হয়ে না দাঁড়ায় বেরুবার পথে। দরজার পাশের সিটে যিনি বসেন অনেক এয়ারলাইনে ক্যাবিন-ক্রুরা তাঁর সঙ্গে কথা বলে রাখেন—তিনি প্রয়োজনে দরজা খোলার মতো জরুরি কাজগুলো করতে সমর্থ কি না, করতে ইচ্ছুক কি না। যদি না থাকেন, তা হলে ঐ সিট থেকে তাঁকে সরিয়ে দেয়া হয়। দরজার সঙ্গের সিটগুলোর সামনে নিচে কিছু রাখাও বারণ—কারণ তাতে বেরুবার সময় যাত্রীরা বাধাগ্রস্ত হতে পারেন। এতসব ব্যবস্থা একেবারে নিয়মিতভাবে করা হয়, শুধুমাত্র কখনো কোনোদিন জরুরি অবস্থায় যাত্রী যেন দ্রুত বেরিয়ে যেতে পারেন সেইজন্য। বেরিয়ে যাওয়াটাই বাঁচার মূলমন্ত্র।

দরজা খোলা হলে তার থেকে বেরিয়ে যাবার সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। কারণ খোলা দরজা থেকে তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে দরজা থেকে নিচে ভূমি পর্যন্ত নেমে পড়ে বাতাসভর্তি রাবারের ঢালু তল। যাত্রীকে শুধু এর উপর বসে একের পর এক গড়িয়ে নিচে চলে যেতে হয়। অনেকটা বাচ্চাদের খেলার স্লাইড বা ঢালু তলের মতো। এ-সময় নিরাপত্তার জন্য সরু ও হাইহিল জুতা খুলে ফেলতে হয়। নিচে পৌঁছেই দৌড়ে বিমান থেকে যত দূরে দ্রুত চলে যাওয়া যায় ততই ভালো—পাছে বড় ধরনের বিস্ফোরণ এখানে ঘটে। বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণটি ঘটলে অবশ্য ইতোমধ্যেই ওখানে দমকল, অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি-সহ সাহায্যকারীর ভিড় থাকবে যাত্রীকে সাহায্য করার জন্য। তা ছাড়া দমকল এসে শিগ্‌গির একটি অগ্নিনির্বাপক ফোমের বাতাবরণ সৃষ্টি করবে বিমানের চারদিকে। অনেক বিমানের সঙ্গেও এই ফোম থাকে পেটের উপর ল্যান্ড করার ঠিক আগে পেটের তলায় ফোমের বিছানা সৃষ্টি করার চেষ্টায়।

প্রত্যেক ফ্লাইটের শুরুতে এর সব কথাই ভালো করে বলে দেয়া হয়, বাকিটা লেখা থাকে পুস্তিকায়—যদিও সবাই জানে হাজার বার বিমানভ্রমণ করেও এরকম একটি অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ। তবুও বিমানযাত্রীকে নিরাপদ করতে সাবধানের মার নেই। শুধু যে বলা হয় তা নয়, সতর্কতামূলক সবকিছু সবাই মানছে কি না সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখা হয়।

পানিতে জরুরি অবতরণ

যেসব ফ্লাইটের যাত্রাপথে কিছুমাত্রও জলভাগ পড়বে সেখানে পানির উপর জরুরি অবতরণের সময় করণীয় বিষয়গুলোও জানিয়ে দেয়া হয়—সবকিছু হাতে-কলমে প্রদর্শন করে। বিমান যদি সঠিক ভঙ্গিতে পানিতে অবতরণ করতে পারে, জ্বালানি পুড়িয়ে ফেলে বা ফেলে দেয় এবং সে-সময় মোটামুটি অক্ষত থাকে, তা হলে পানিতে

বিমানের ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা কম—একটি জাহাজের মতোই এটি ভাসতে পারবে—যতক্ষণ না উদ্ধারকারীরা এসে উদ্ধার করছে। তা সত্ত্বেও নানা কারণে যাত্রীদেরকে এখানেও দ্রুত বিমান ত্যাগ করতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে দরজা খোলার পর ফোলানো রাবারের ঐ ঢালু তলগুলো এবার জীবন-ভেলায় রূপান্তরিত হয়। সব যাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্টসংখ্যক এরকম ভেলা থাকে। তা ছাড়া প্রত্যেক যাত্রীর আবার নিজস্ব লাইফ জ্যাকেট রাখা থাকে সাধারণত যার-যার সিটের নিচে। জরুরি অবতরণের আগে এটি কীভাবে পরে নিতে হবে এটি সবসময় ভালো করে বুঝিয়ে দেয়া হয় প্রত্যেক যাত্রার শুরুতে। বিমান থেকে বেরুবার পর কীভাবে এটি সঙ্গের সুতা টেনে এবং / অথবা মুখে ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে নিতে হয় (বেরুবার আগে ফোলালে বেরুতে অসুবিধা হবে), কীভাবে পানির সংস্পর্শে গেলে এর দৃষ্টি আকর্ষণকারী বাতি জ্বলে ওঠে অথবা কীভাবে সঙ্গের বাঁশি বাজিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে—এ সবই সুন্দরভাবে বলে দেয়া হয় প্রত্যেক যাত্রাতেই।

সিম্যুলেটরে প্রশিক্ষণ

এ তো গেল জরুরি অবতরণ করতে হলে—যার সম্ভাবনা সাধাণত খুবই কম। তবে বিমানের ওড়ার সময় কখনো-কখনো ছোটবড় যান্ত্রিক গোলযোগ যে ঘটে না তা নয়। এগুলোর মধ্যে খুব কমসংখ্যকই বড় কিছুতে রূপ নেয়। আর যান্ত্রিক অসুবিধা সত্ত্বেও বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে প্রায় ক্ষেত্রেই উড্ডয়ন অব্যাহত রাখা যায় অথবা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিকটবর্তী কোনো এয়ারপোর্টে প্রায় স্বাভাবিক অবতরণ করা যায়। পাইলট-প্রশিক্ষণের একটি বড় অংশ হচ্ছে সিম্যুলেটরে বিমানচালনা। এটি হল একধরনের কৃত্রিম ব্যবস্থা—যেখানে যান্ত্রিক অনুভূতিগুলো সৃষ্টি করে এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে বিমান ওঠার, ওড়ার, নামার এবং সবরকম স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার সুযোগ থাকে। পাইলট সবরকম নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে একে নিয়ন্ত্রণও করতে পারেন, নিয়ন্ত্রণে সফল হলেন, না 'দুর্ঘটনায়' পড়লেন তাও বুঝতে পারেন। কিন্তু সবই ঘটে মিছামিছি—আসলে আদৌ কিছু ওড়ে না, সিম্যুলেটরেট তার নিজের জায়গাতে থেকেই নড়াচড়া করে এবং পর্দার দৃশ্য ও শব্দ তৈরি করে উড্ডয়নের সকল ভাব সৃষ্টি করে এমনকি টারবুলেন্সের উথালপাথাল দুর্ঘটনার ভাঙচুর, জরুরি অবতরণ—সবসহ। কিন্তু এর ভেতরে পাইলট সবই সত্যিকার ঘটনার মতো দেখতে ও অনুভব করতে পারেন। এভাবে তিনি সত্যি-সত্যি বিমানচালনায় কোনো দুর্ঘটনায় না পড়েও সবরকম দুর্ঘটনা মোকাবেলায় ভালোরকমে প্রশিক্ষিত ও অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেন। এবং একইভাবে তাঁর সক্ষমতাও যাচাই করা যায় কোনো ক্ষতি না ঘটিয়ে।

ইঞ্জিন বিকল হলে

বিমানের জন্য গুরুতর যান্ত্রিক গোলযোগের একটি বড় ঘটনা হল ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাওয়া। এটি টেইকঅফের সময়েই হতে পারে। টেইকঅফের চূড়ান্ত বেগ এসে গেলে যখন না উড়ে গিয়ে আর উপায় থাকে না তখন একাধিক ইঞ্জিনের একটি বন্ধ হলেও উপরে নিরাপদ একটি উচ্চতায় চলে যাওয়া যায়। সেখান থেকে জ্বালানি ফেলে দেয়ার ব্যবস্থা করে তারপর অবতরণ করা যায়। আধুনিক জেটগুলো তিনটির মধ্যে দুটি ইঞ্জিন বন্ধ অবস্থাতেও অবতরণ করতে পারে। এ ধরনের উড্ডয়ন ও অবতরণে এক দিকের পাওয়ারহীনতার কারণে বিমান ঘুরে যেতে চায় বলে রাডারের হাল ঘুরিয়ে সেই প্রবণতা রোধ করে চলতে হয়। এ-অবস্থায় ল্যান্ডিং-এর আর একটি অসুবিধা হল এতে লিফ্‌ট্ বজায় রাখতে সাধারণের চেয়ে বেশকিছু বেশি বেগের উপর থাকতে হয় যা ল্যান্ডিংকে অপেক্ষাকৃত ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে পারে। ভূমিস্পর্শের পর সঙ্গে-সঙ্গে অতিকড়া ব্রেক কষতে হয় বিমানকে থামাতে, কারণ বন্ধ ইঞ্জিন থেকে রিভার্স থ্রাস্ট পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই এই কাজের ক্ষেত্রে।

এসব বিশেষ অবস্থা মানিয়েই যদিও তা করতে হয়, বিমানের দু'একটি ইঞ্জিন নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও নিরাপদে অবতরণ প্রায় নিয়মিতভাবেই সম্ভব। সিম্যুলেটরে এরকম অবতরণ করার প্র্যাকটিস করে পাইলট বেশ অভ্যস্ত থাকেন। চারটি ইঞ্জিনের মধ্যে চারটিই বন্ধ হয়ে গেছে, এমন অভাবনীয় অবস্থা থেকেও বিমানকে অক্ষত রাখার নজির রয়েছে। সাধারণত এক্ষেত্রে বিমানকে নাক একটু নিচু করে যত মসৃণভাবে সম্ভব নিচে নেমে আসতে দেয়া হয় মাধ্যাকর্ষণের উপর ছেড়ে দিয়ে। এই গতির কারণে তখন প্রয়োজনীয় লিফ্‌ট্ বজায় থাকে। নিয়ন্ত্রিতভাবে এভাবে কিছুক্ষণ বিমানকে ভাসিয়ে রেখে ইতোমধ্যে যান্ত্রিক ত্রুটি সারিয়ে ইঞ্জিন চালু করা ও স্বাভাবিক উড্ডয়নে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়েছে বেশকিছু।

এসব ক্ষেত্রে একটি বড় অসুবিধা হল সব ইঞ্জিন বন্ধ হওয়ার অর্থ হল বিদ্যুতের উৎস বন্ধ হয়ে যাওয়া, হাইড্রোলিক সিস্টেম ইত্যাদিও বেকার হয়ে যাওয়া। ইঞ্জিনের শক্তিতেই বিদ্যুৎ জেনারেটর ও বিভিন্ন যান্ত্রিক ব্যবস্থায় শক্তি সরবরাহ করা হয়। এর ফলে স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাগুলো বিকল হয়ে যায়। এজন্য অবশ্য কিছু জরুরি বিকল্প বিদ্যুৎ-উৎস রাখা হয়। তা ছাড়া এরকম অভাবনীয় অবস্থায়ও যাতে যথেষ্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় সেজন্য বাইরে ডানার নিচে এ-সময় বিশেষ টারবাইন চালু করা হয় যা দ্রুত ধাবমান বাতাসের শক্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। এ-সময় কষ্টসাধ্য হলেও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাগুলোকেও বিকল্প ব্যবস্থায় পরিচালনা করে বিমানের ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব।

বিমানবন্দরে সতর্কতা

সতর্কতামূলক এতসব ব্যবস্থা বিমানের সঙ্গেই রয়েছে নানা ধরনের জরুরি অবস্থার মোকাবেলার জন্য। একটি বিশেষ বিমান বা একজন বিশেষ পাইলট হয়তো কখনোই এর গুরুত্বপূর্ণ কোনোটির মোকাবিলা করবে না—তবুও সাবধানের মার নেই। আর একই সঙ্গে এয়ারপোর্টে রয়েছে আরো অন্যান্য বহু সতর্কতা। এর মধ্যে রয়েছে পাখি-তাড়ুয়ার দল! পাখি জেট ইঞ্জিনের জন্য বিশেষভাবে বিপজ্জনক হতে পারে, কারণ এই ইঞ্জিনের বাতাস গেলার সঙ্গে-সঙ্গে পাখি গেলারও প্রচুর নজির আছে। টেইকঅফ বা ল্যান্ডিং-এর সময় বিমান যেন পাখির সামনে না পড়ে এজন্য এয়ারপোর্ট এলাকার আকাশ যথাসম্ভব পাখিমুক্ত রাখার চেষ্টা করতে হয়। পাখিদের কাছে অপ্রিয় বিভিন্ন শব্দ করে, মাঝে-মাঝে বাতাসে গুলি ছুড়ে এদেরকে এ-অঞ্চলে আসতে নিরুৎসাহিত করা হয়। একইভাবে রানওয়েগুলো একেবারে নিষ্কণ্টক রাখাটিও খুব জরুরি। রানওয়ের উপর সামান্য ছোট্ট একটি ফল বা নাট-বল্টুও যদি পড়ে থাকে এর উপর দিয়ে ছুটে-যাওয়া বিমানের জন্য তার পরিণতি মারাত্মক হয়ে পড়ার উদাহরণ রয়েছে। সাধারণত টায়ার ফেটে যাওয়া থেকেই এরকম হতে পারে। অথচ দিনে-রাতে অসংখ্যবার যার উপর বিমান নামছে, যেখান থেকে বিমান উঠছে সেখানে বিমান থেকেই তো ছোটখাটো জিনিস খুলে পড়া বিচিত্র নয়। এজন্য সর্বক্ষণ রানওয়ের প্রতি ইঞ্চির উপর কড়া নজর রাখতে হয়, কিছু দেখলেই তুলে ফেলতে হয়।

সব পাখি ঘরে ফেরে

আমাদের বিমান যখন যাত্রা শুরু করছিল তখন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বোঝাতে ব্যস্ত ছিলেন ক্যাবিন-ক্রুরা। এর মানে এই নয় যে, ভ্রমণের সারাটি পথ ক্রুরা যাত্রীদেরকে এই নিয়ে ব্যতিব্যস্ত রেখেছেন। বরং ঘটেছে এর ঠিক উলটো। ক্যাবিন-ক্রুরা সারাক্ষণ চেষ্টা করে গেছেন ভ্রমণ কীভাবে উপভোগ্য হবে তা-ই নিয়ে। কী কী সিনেমা দেখানো হবে, খাবারের তালিকায় কী আছে, ডিউটি-ফ্রি লোভনীয় বস্তু কী কেনা যেতে পারে এসব নিয়েই তাঁরাও ব্যস্ত ছিলেন, যাত্রীদেরকেও ব্যস্ত রেখেছেন। তা ছাড়া কথায়-কথায় ড্রিংকস, স্যান্ডউইচ এগুলোও এনে দিয়েছিলেন প্রধান খাবারের মাঝে-মাঝে। দেয়া হয়েছে আজকের স্থানীয় পত্রিকা, ফ্লাইট ম্যাগাজিন। পুরো যাত্রার প্রতি মুহূর্তে পরদায় ম্যাপের উপর দেখেছি আমরা কোন পথ ধরে চলেছি, এখন কোথায় কোন শহর, কোন দেশ, কোন মরু বা কোন পর্বতের উপর দিয়ে চলেছি অথবা কোন সমুদ্রের উপর দিয়ে। কত উপরে আছি, কত বেগে চলেছি, কোথায় কী সময় পৌঁছতে কত বাকি এসবও যথারীতি দেখিয়ে চলেছে পরদা। যেখানে যাচ্ছি সেখানেও অবসরে দেখার মতো, করার মতো কী রয়েছে তাও তুলে ধরা হয়েছে ডকুমেন্টারি সিনেমার আদলে। সবকিছু উপভোগ্য করে ব্যস্ত রেখেছে বৈকি! এর মধ্যে ক্লান্ত যাত্রীরা দিব্যি এক পশলা ঘুমিয়েও নিয়েছেন নিশ্চিন্তে।

যেই ক্যাপ্টেন ও ফার্স্ট অফিসারের অত্যন্ত মনোযোগী ও ব্যস্ত থাকার কথা উড্ডয়ন পরিচালনায় তাঁরাও সময়-সময় যাত্রীদের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। মাঝে-

মাঝে কয়েকবার ক্যাপ্টেন স্বয়ং মাইক্রোফোনে যাত্রীদেরকে যাত্রাপথের বিবরণ শুনিয়েছেন, সামনে আবহাওয়ার অবস্থা অবহিত রেখেছেন। যেখানে নামব সেখানকার আবহাওয়া কী আশা করতে পারি তাও জানিয়েছেন। পথে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নগর, নদী ইত্যাদি পার হবার সময় বলেছেন সে-কথা, জানালা দিয়ে তাকিয়ে কোনো বিখ্যাত ল্যান্ডমার্ক দেখার সম্ভাবনা থাকলে তাও জানিয়ে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে উৎসাহী ও কৌতূহলী যাত্রীর জন্য বিমানযাত্রায় রয়েছে তা মেটাবার অনেক খোরাক।

সময়টা দেখতে-দেখতে চলে যায়, একসময় যাত্রা শেষ হয়ে আসে। আমরা গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে যাই। এবার পাখির অবতরণের পালা।

নিচে নামার শুরু

এতক্ষণ বিমান চলছিল ঊর্ধ্বাকাশের কোনো-একটি সুনির্দিষ্ট আকাশপথ ধরে। এবার এই পথ থেকে ধীরে-ধীরে নেমে আসতে হবে গন্তব্যের এয়ারপোর্টে স্থানীয় আকাশপথ ধরে। সাধারণত বড়-বড় জেটবিমানগুলো গন্তব্যের একশো মাইল দূরে থাকতেই নামা শুরু করে। এই প্রক্রিয়ায় এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার কিন্তু আগাগোড়া জড়িত থাকেন। তিনি আকাশপথের নিচের ধাপগুলোর যে-যে অংশ অন্য বিমান থেকে মুক্ত আছে তা দেখে নিয়ে সেভাবে বিমানকে নামতে পরামর্শ দেন। যতক্ষণ পর্যন্ত একটি ধাপ থেকে সব বিমান বেরিয়ে না যাচ্ছে, ততক্ষণ নতুন বিমানটিকে ঐ ধাপে নেমে আসতে দেয়া হয় না। এভাবে নির্দেশ অনুযায়ী ধাপে-ধাপে বিমানটিকে নামতে হয়। এক ধাপ নেমে আবার সমতলে কিছুটা চলে আবার নামা। এ-সময় গতি সাধারণভাবে কিছুটা কমিয়ে আনা হয়। থ্রটল নিয়ন্ত্রণ করে পাওয়ার কমিয়ে বাড়িয়ে নিচে নামার হারটি ঠিক রাখা হয়। আবার বিমানের বেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এর নাক উঁচু-নিচু করা হয়। কাজেই গতিবেগ নিয়ন্ত্রণে থ্রটল আর উপর-নিচে যাবার জন্য ইলেভেটর দিয়ে নাক উঁচু-নিচু করা এই সরল বিভাজন তখন খাটে না।

চক্কর দিয়ে অপেক্ষায়

এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের এ সময় সতর্ক ভূমিকায় থাকতে হয়। ব্যস্ত এয়ারপোর্টগুলোতে এ-সময় তিনি নামতে ইচ্ছুক সব বিমানকে একটি প্রবেশ পয়েন্টের মধ্য দিয়ে একের পর এক সারিবদ্ধ করেন। অতিব্যস্ত এয়ারপোর্টের ক্ষেত্রে একাধিক প্রবেশপয়েন্ট দিয়ে ঢোকা যায়—কন্ট্রোলার বিমানগুলোকে সুবিধামতো বিভিন্ন প্রবেশপয়েন্টে ভাগ করে দেন—যাতে একটির পর একটি ঢোকার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবধান বজায় রাখা যায়। এজন্য প্রবেশ পয়েন্টে এনে সাধারণত বিমানগুলোকে শেলফের তাকের মতো বিভিন্ন উচ্চতায় একই বৃত্তে ঘুরে-ঘুরে নামার জন্য অপেক্ষা

করতে দেয়া হয়। এ-ব্যবস্থাকে বলা হয় হোল্ডিং স্ট্যাক—অর্থাৎ অপেক্ষার তাক। অপেক্ষার সময় চক্কর দেবার গতিপথটি আসলে বৃত্তাকার নয়—বেশ লম্বাটে উপবৃত্তের মতো। এ-জায়গাটি সাধারণত এয়ারপোর্ট থেকে বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে থাকে এবং একটি বিশেষ রেডিয়ো বিকন দিয়ে চিহ্নিত থাকে। এর চারদিকে ১৬ কিলোমিটার আকাশ-এলাকা থাকে সংরক্ষিত অঞ্চল। এখানে কোনো বিমান চলাচল করতে পারে না। হোল্ডিং স্ট্যাকে একটি তাকের থেকে অন্য তাকের দূরত্ব এক হাজার ফুট। নতুন যে-বিমানটি এখানে যোগ দেবে সেটি সবার উপরের তাক থেকে একই সমতলে চক্কর দিতে থাকবে, যতক্ষণ না পরের নিচের তাকটি খালি হলে সেখানে নেমে আসার অনুমতি পায়। সাধারণত পুরো এক চক্কর খেতে চার মিনিট সময় নেয়। সবচেয়ে নিচের তাকে যে-বিমানটি রয়েছে সেটিই ল্যান্ড করার অনুমতি পায়। এটি তাক থেকে বেরিয়ে গেলে উপরের সব বিমান তখন এক তাক করে নেমে আসতে পারে। এভাবে নেমে এসে-এসে সর্বনিম্ন তাক থেকে হোল্ডিং স্ট্যাক ত্যাগ করার পরই শুরু হয় বিমানের আসল ল্যান্ডিং-প্রক্রিয়া। অবশ্য যে-এয়ারপোর্টে অবতরণশীল বিমানের ভিড় একই সঙ্গে হচ্ছে না, সেখানে হোল্ডিং স্ট্যাকেও আদৌ যেতে হয় না, সরাসরি ল্যান্ডিং-এ চলে যেতে পারে।

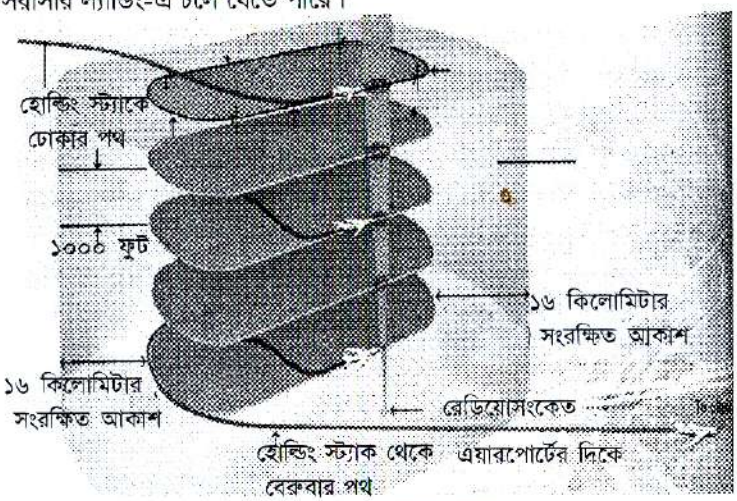

ব্যস্ত এয়ারপোর্টে ল্যান্ডিং-এর আগে চক্কর খেয়ে অপেক্ষা

ল্যান্ডিং

এখান থেকে সাধারণত ল্যান্ডিং করানোর দায়িত্ব আর একজন ট্রাফিক কন্ট্রোলার গ্রহণ করেন। তাঁর কর্তব্য হল এই বিমানটিকে এর আগে নামতে যাওয়া বিমানের অন্তত

চার মাইল পেছনে রেখে একে রানওয়ের দিকে সঠিক ভঙ্গিতে নিয়ে যাওয়া। ব্যস্ত এয়ারপোর্টে তাঁর অ্যাপ্রোচ-রাডারের পরদায় দেখা যায় চার মাইল দূরত্বে পরপর বিমানগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী ফোঁটা কীভাবে সারিবদ্ধভাবে রানওয়ের দিকে এগুচ্ছে।

অতিব্যস্ত এয়ারপোর্টে প্রায়ই আসা-যাওয়ার বিমানের জ্যাম লেগে যায়। তখন এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের উপর অত্যন্ত চাপ পড়ে প্রত্যেক বিমানকে নিরাপদ নির্দেশনা দেবার ক্ষেত্রে। এর মধ্যে কোনোটি নিয়ে যদি কোনো জটিলতা দেখা দেয় তখন তো কথাই নেই। এজন্য মাথা ঠাণ্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নেয়া ও যোগাযোগ রক্ষা করা কন্ট্রোলারের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গুণ। প্রায় ১২ মাইল দূরে এবং ৩,৫০০ ফুট উচ্চতায় থাকতে পাইলট ILS ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁর বিমানকে সংযুক্ত করেন। ILS হল ইনস্ট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেম, যান্ত্রিক অবতরণ-ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় রানওয়ে থেকে চারটি সংকেত বিমানের ফ্লাইট-ডেকের যন্ত্রে পাঠাতে থাকে। এর একটি হল লোকালাইজার বিম যা বিমানকে রানওয়ের বরাবর পথ দেখায়। এর সাহায্যে তাঁর যন্ত্রের ডায়ালে পাইলট দেখতে পান তিনি রানওয়ে বরাবর আছেন না কি এর থেকে ডানে-বামে আছেন। একইভাবে দ্বিতীয়টি হল গ্লাইড-স্লোপ বিকন। এর সাহায্যে পাইলট বুঝতে পারেন প্রতি মুহূর্তে তাঁর উচ্চতা সঠিক রয়েছে কি না। এটি পাইলটকে দেখিয়ে দেয় তিনি সঠিক কোণ করে নেমে আসছেন কি না—যাতে রানওয়ের সঠিক জায়গায় ভূমিস্পর্শ করতে পারেন। বাকি দুটি রেডিয়ো সিগন্যাল রানওয়ে থেকে ৫

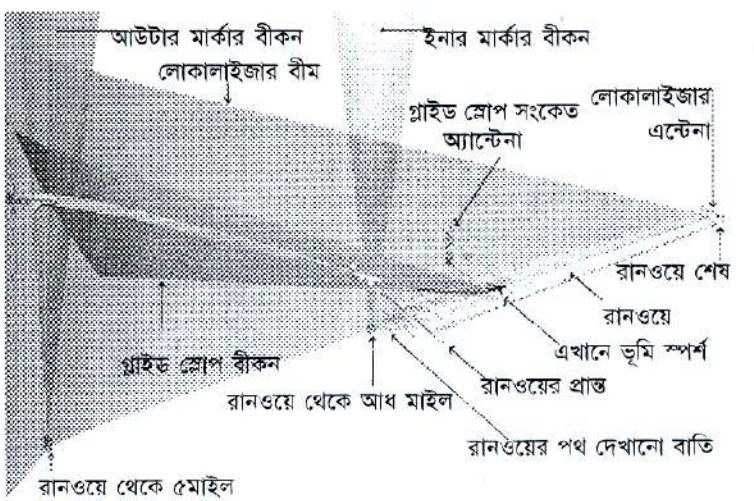

ILS বা ইনস্ট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেম

মাইল ও আধ মাইল এই দুটি দূরত্ব নির্দেশ করে—প্রথমটি আউটার মার্কার ও দ্বিতীয়টি ইনার মার্কার হিসাবে। ILS-এর পথপ্রদর্শনে পাইলট কুয়াশা ইত্যাদি অবস্থায় রানওয়ে দূরে থেকে না দেখেও বিমান অবতরণ করাতে পারেন, যদিও দেখা অবস্থায় ল্যান্ড করতেই তিনি পছন্দ করবেন। তা ছাড়া আজকাল উন্নত সব এয়ারপোর্টে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ল্যান্ডিং-এরও ব্যবস্থা থাকে অটোপাইলটের সাহায্যে। সেক্ষেত্রে পাইলটকে তাঁর যন্ত্রে ILS-এর নির্দেশমতো নেমে আসতে হয় না, বরং বিমানের সব নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করা হয় রানওয়ে থেকে আসা রেডিয়োসংকেতের দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে। এক্ষেত্রে পাইলট অবতরণের সকল দায়িত্ব অটোপাইলটের হাতে ছেড়ে দিতে পারেন।

ব্যস্ত এয়ারপোর্টে অবতরণকারী বিমানগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলে দেখা যায় কেমন করে একের পর এক প্রত্যেকটি বিমান একই পথ ধরে, এই ভঙ্গিতে এসে রানওয়েতে নেমে দৌড়ে গিয়ে থেমে যাচ্ছে, তারপর পরের বিমানকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে রানওয়ে থেকে বেরিয়ে তার নির্দিষ্ট দাঁড়াবার জায়গার দিকে চলে যাচ্ছে। বলতে গেলে কয়েক মিনিট পরপর সারাক্ষণ এটি ঘটতেই থাকে। তেমনি আবার অন্য রানওয়েতে চলতে থাকে সারিবদ্ধ বিমানের একের পর এক টেইকঅফের দৃশ্য। এটি দেখে বোঝা যায় এখানকার এয়ারট্রাফিক কন্ট্রোলারদের কীরকম ব্যস্ত আর সন্ত্রস্ত থাকতে হয় প্রতিটি মুহূর্ত।

নামার সময় বিমানের উড্ডয়ন

আমাদের বিমানে যখন থেকে নামার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে, তখন থেকেই বিমানের বেগ ধীরে কমিয়ে আনার ব্যবস্থা নিতে হয়েছে, যাতে ঠিক নামার মুহূর্তে নিরাপদ বেগের মধ্যে থাকা যায়। এজন্য থ্রটল নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও স্পয়লার প্রয়োগ করতে হয়েছে কখনো-কখনো গতি কমাবার জন্য। বেগ কমানোর অর্থ হল লিফ্‌ট্‌ও কমে যাওয়া। প্রয়োজনীয় লিফ্‌ট্‌ কিন্তু বরাবর বজায় রাখতেই হবে। কম গতিতেও লিফ্‌ট্‌রক্ষার জন্য ফ্ল্যাপ ইত্যাদির প্রয়োগ করতে হয়।

গতি ২৩০ মাইলের মতো কমে এসে ফ্ল্যাপ ১৮ ডিগ্রি কোণ করে মেলে দেয়া যায়। এ-সময় ল্যান্ডিং গিয়ার অর্থাৎ চাকাও নামিয়ে দেয়া হয়। এরপর গতি আরো কমে গেলে লিফ্‌ট্‌ পাওয়ার জন্য ফ্ল্যাপকে আরো নিচু করে ফেলা হয়। শেষ পর্যন্ত ঘণ্টায় ১৩০ মাইলের দিকে নেমে ফ্ল্যাপ সর্বোচ্চ ৪৫° কোণ নিয়ে নেয়। এতক্ষণ বিমান নিচের দিকে কিছু কোণ করে নেমে এলেও অবতরণের কিছু আগে এটি ভূমি-সমান্তরাল হয়ে নেয়। অবতরণের একটুখানিক আগে গতি আরো কমিয়ে ফেললে লিফ্‌ট্‌ সংরক্ষণের জন্য বিমানের নাক কিছু উঁচু করে বাতাস কাটার কোণ কিছু বাড়িয়ে

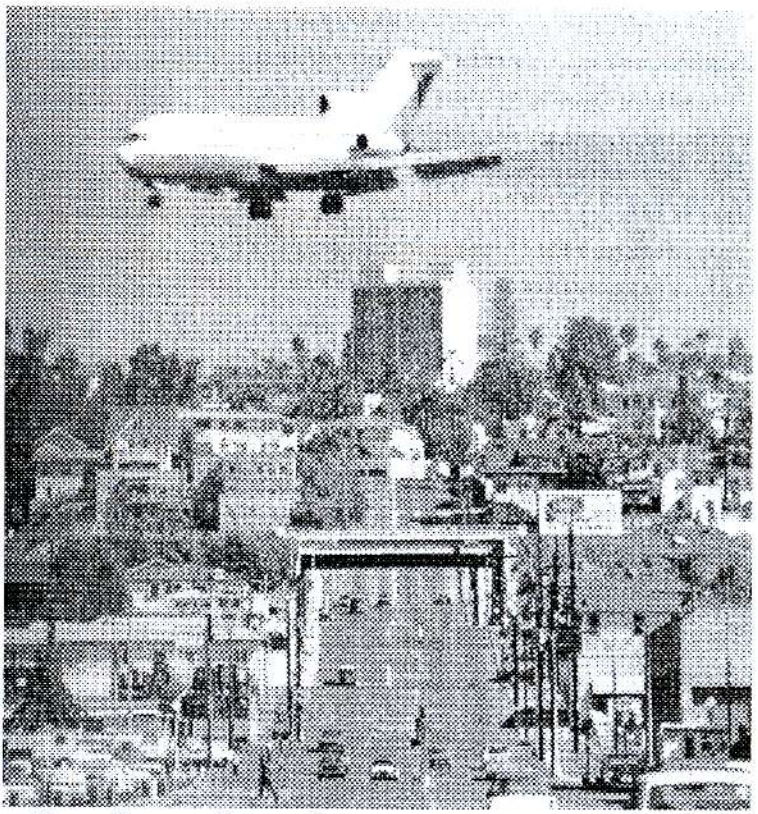

ল্যান্ডিং-এর কিছু আগে বিমান। গতি খুব কম। ডানার পেছনে ফ্ল্যাপ নামিয়ে লিফ্‌ট্ রক্ষা করা হচ্ছে। চাকা নামিয়ে দেয়া হয়েছে। নাক এখনো কিছুটা নিচের দিকে।

নিতে হয়। এ-অবস্থাতেই পেছনের প্রধান চাকাগুলো ভূমি স্পর্শ করে, নাক তখনো ঊর্ধ্বমুখি ও নাকের চাকা তখনো উপরে। পরে এটিও আস্তে নেমে আসে ভূমিতে। ভূমিস্পর্শের সঙ্গে-সঙ্গে পাইলট থ্রটল সম্পূর্ণ টেনে নিয়ে সামনে এগুবার পাওয়ার সম্পূর্ণ বন্ধ করে এবার পেছনের দিকে নেবার মতো রিভার্স থ্রাস্ট প্রয়োগ করেন থ্রটলকে সেদিকে নিয়ে গিয়ে। এটি করা হয় বিমানকে রানওয়ের উপর দ্রুত থামিয়ে ফেলার প্রয়োজনে। থামার জন্য বাতাসের বাধা তৈরি ও লিফ্‌ট্ নষ্ট করে দেবার জন্য ডানার উপরে লিফ্‌ট্ ডেম্পার খাড়া করে তোলা হয়। চাকার উপর সাধারণ ব্রেকও প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে যথেষ্ট রানওয়ে বাকি থাকতেই বিমান নিরাপদে থেমে যেতে পারে।

থেমে যাওয়ার পর বিমানের কর্তব্য যত তাড়াতাড়ি পারা যায় রানওয়ে ছেড়ে দেয়া। এজন্য আগে পাশের ট্যাক্সিওয়ে দিয়ে সে তখন এগোয় ইঞ্জিনের কিছু পাওয়ার বজায় রেখে। এ-সময় রানওয়েতে আঘাত না পাওয়ার জন্য ফ্ল্যাপ ইত্যাদি গুটিয়ে নেয়া হয়। রাডারের বদলে তখন সামনের চাকার স্টিয়ারিঙের মাধ্যমেই বিমানকে বাম-ডান করানো হয়। কন্ট্রোল টাওয়ারের নির্দেশ অনুযায়ীই পাইলট সঠিক পথ খুঁজে নেন, অথবা সামনে কোনো গাড়ি পথ দেখিয়ে নেয়। সঠিক গেইটে এসে থামা পর্যন্ত এভাবে খানিকক্ষণ চলতে হতে পারে তাকে গাড়ির মতো। অবশেষে গেইটে এসে বন্দরে লাগা। ক্যাপ্টেনের চিরায়ত নির্দেশ—'ক্যাবিন-ক্রু ডিসআর্ম অল ডোরস প্লিজ'। অবশেষে ইঞ্জিন এখন সম্পূর্ণ বন্ধ। যাত্রীদের সামনে সিটবেল্ট বাঁধার সংকেত নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। তাঁরা এখন উঠে ক্যাবিন লাগেজ বের করার, পোশাক ঠিকঠাক করার কাজে লেগে যেতে পারেন। যাত্রাশেষে তাঁরা মুখিয়ে আছেন বাইরে তাঁদের জন্য অপেক্ষমাণদের সঙ্গে যোগ দিতে। এটি নিশ্চিত যে তাঁদের অধিকাংশই এতক্ষণ বিমানে, এয়ারপোর্টে, নানা জায়গার এয়ার কন্ট্রোল টাওয়ারে কী ঘটে গেছে সে-সম্বন্ধে মোটেই চিন্তিত ছিলেন না। চিন্তিত ছিলেন না কারণ অন্যরা তাঁদের

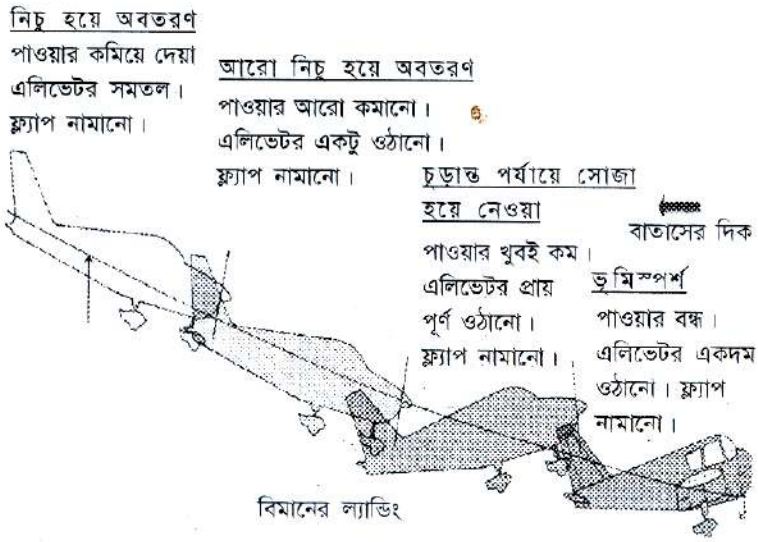

বিমানের ল্যান্ডিং

হয়ে সে-চিন্তা, সে-কাজ করে গেছেন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে—একটি নিরাপদ ও উপভোগ্য বিমানযাত্রার সফল সমাপ্তি টানতে।

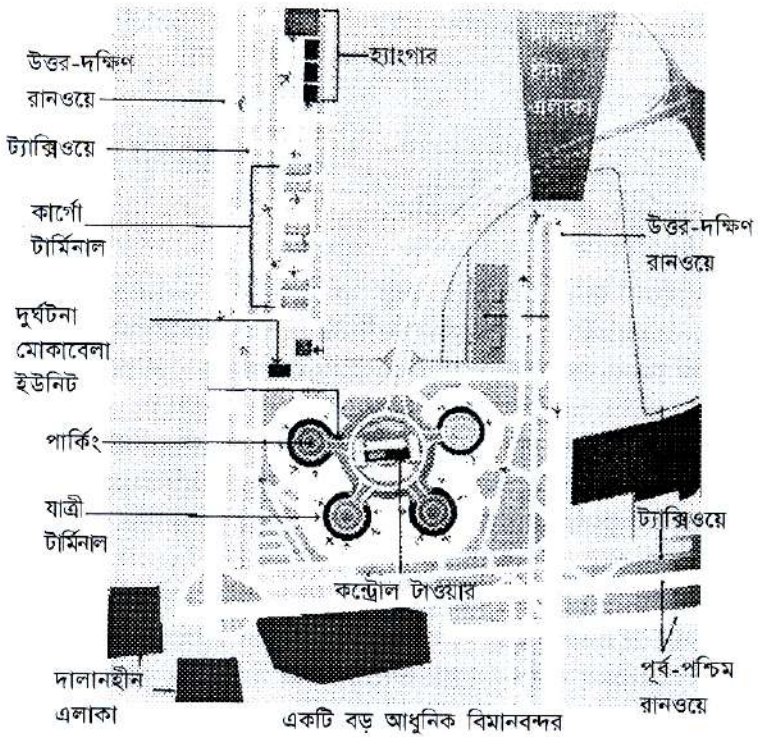

একটি বড় আধুনিক বিমানবন্দর

আগামীতে

আমাদের যাত্রা শেষ হয়েছে। তবুও একটু ভেবে দেখা যাক আগামী দিনগুলোতে আমরা কোন-কোন দিক থেকে ভিন্নরকমের বিমানযাত্রা আশা করতে পারি। মৌলিক যে-পরিবর্তনগুলো স্বাভাবিকভাবে আশা করা হবে, এবং যেজন্য কাজ এখনই অনেক এগিয়ে রয়েছে তা হল আরো দ্রুতগতি, আরো আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরো ব্যয়সাশ্রয়। হয়তো এগুলোর সবক'টি একই বিমানে বা একই বিমানযাত্রায় একসঙ্গে অর্জিত হবে না। কেউ চাইবেন অধিক গতি, কেউ চাইবেন বেশি আরাম, আবার হয়তো কেউ চাইবেন খরচ কমাতে।

শব্দের চেয়ে অধিক গতি

অনেক বছর ধরে শব্দের চেয়ে অধিক গতিতে একটি যাত্রীবাহী বিমান নিয়মিত দূরপাল্লায় যাতায়াত করেছে—সেটি কনকর্ড। আর সামরিক প্রয়োজনে এরকম দ্রুতগামী বিমান তো অনেকই রয়েছে। এসব সত্ত্বেও এরকম উচ্চগতির বিমানভ্রমণ এখনো সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়নি, তবে সামনে হতে পারে। এ-মুহূর্তে প্রধান বড় বিমান-নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো অবশ্য উচ্চগতির চেয়েও সুপরিসরতা ও ব্যয়সাশ্রয়তা ইত্যাদির উপরই অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে, এবং সেভাবেই তৈরি হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মের যাত্রীবাহী বিমানগুলো। কিন্তু আগে হোক পরে হোক অল্প সময়ে দীর্ঘপথ অতিক্রমের প্রয়োজন সাধারণ বিমানযাত্রীরও যে হবে তা অবধারিত।

সমুদ্র-সমতলে শব্দের গতি ঘণ্টায় ৭৪০ মাইল। এটি অবশ্য উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে কিছুটা কমে যায়, যেমন ৪০,০০০ ফুট উচ্চতায় এই গতি ৬৬০ মাইল। এর চেয়ে বেশি গতিকে সুপারসনিক গতি বা শব্দোত্তর গতি বলা হয়। তা অর্জন করার অর্থ শুধু গতি বাড়ানোই নয়, এখানে অন্য জটিলতাও রয়েছে। বিমান যতক্ষণ শব্দের চেয়ে কম গতিতে চলছে, ততক্ষণ এটি গতিপথে সামনের দিকে বাতাসের একধরনের তরঙ্গ সৃষ্টি করে চলে যা সামনের বাতাসকে ফাঁক করে বিমানকে যাবার সুবিধা করে দেয়। ফলে বিমানের উপর প্রবহমান বাতাসের ঘনত্বে তেমন কোনো পরিবর্তন আসে না। ঐ তরঙ্গ অনেকটা শব্দতরঙ্গের মতো এবং শব্দের গতিতেই তা এগোয়। বিমান যখন শব্দ-গতির খুব কাছাকাছি গতিতে পৌঁছে যায়, তখন ঐ তরঙ্গ আর বিমান একই বেগে এগুচ্ছে বলে তরঙ্গ এগিয়ে গিয়ে আর বাতাসকে ফাঁক করতে পারে না। ফলে এর সামনে সৃষ্টি হয় ঘনীভূত বাতাসের একরকম বাধার দেয়াল—যা বিমানকে একটি প্রচণ্ড শকের সঙ্গে আঘাত করে। এই শকতরঙ্গ উত্তাপ বাড়ায়, ডানা আর লেজকে বিপাকে ফেলে, এবং গতিবেগ কমিয়ে ফেলতে চায়—প্রচণ্ড একটি নূতন ড্র্যাগের সৃষ্টি করে লিফ্‌ট্ কমিয়ে ফেলে। বিমান তখন 'শক স্টল' নামের বিশেষ ধরনের স্টলিংয়ের সম্মুখীন হয়। এ-সময় নিয়ন্ত্রণ রাখা কঠিন হয়।

এরকম পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য কনকর্ডে একের উপর আরেক দুটি রাডারের ব্যবস্থা আছে, তা ছাড়া আছে সম্মিলিত একধরনের এলিভেটর ও এইলরন—যার ছয়টি রয়েছে। তা ছাড়া শকতরঙ্গকে দুর্বল করে দেবার জন্য ডানার মধ্যে একধরনের বায়ুঘূর্ণির সৃষ্টির ব্যবস্থা রয়েছে। শেষ অবধি অবশ্য শকতরঙ্গ এড়িয়ে সুপারসনিক বিমানভ্রমণের একমাত্র উপায় হল অতিদ্রুত গতিতে শব্দের গতি পার হয়ে এর চেয়ে অধিক গতিতে চলে যাওয়া। একবার সেই সুপারসনিক গতিতে চলে যেতে পারলে জটিলতাগুলো কমে আসে। উচ্চগতি অর্জনের জন্য কনকর্ডের রয়েছে শক্তিশালী ইঞ্জিন, তা ছাড়া এর পাতলা, ত্রিভুজ আকৃতির ডানা ড্র্যাগ কমাতে সাহায্য করে। এরকম ডেলটা উইং বা ত্রিভুজাকৃতির ডানার বৈশিষ্ট্য হল অতিউচ্চ গতিতে এর ড্র্যাগনিরোধী, লিফ্‌ট্প্রদায়ী কার্যকারিতা বেশি। সেইসঙ্গে সাধারণ ডানায় বাতাস কাটার কোণটি বেশি বড় হলে ডানার উপরের যে ঘূর্ণি একে স্টল করিয়ে ফেলে দিতে চায়, ডেলটা উইং-এ তা হয় না। অল্পগতিতে ঐ ঘূর্ণিই বরং তাকে লিফ্‌ট্ পেতে সাহায্য করে। তাই টেইকঅফ ও ল্যান্ডিং-এর সময় কনকর্ড তার লিফ্‌ট্ বজায় রেখে বাতাস কাটার কোণ অনেক বড় করে, ভূমির সঙ্গে প্রায় ৩৫° কোণ করে চলে এ-অবস্থায় পাইলট সামনের রানওয়ে দেখতে পাবেন না বলে। বিমানের অগ্রভাগের ছুঁচালো অংশটি এ-সময় বাঁকা করে নামিয়ে নিচের দিকে ঘুরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা রয়েছে কনকর্ডে। ডানার তুলনায় মূল বিমান বেশ ছোটখাটো, সরু—অত্যন্ত স্ট্রিমলাইন করা। এর ফলে হালকা অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় দিয়ে এটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

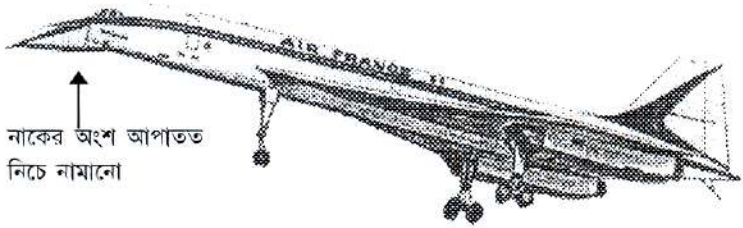

সুপারসনিক যাত্রীবাহী বিমানে কনকর্ড ল্যান্ড করার পূর্বমুহূর্তে। গতি এখন কম। ত্রিভুজাকার ডেলটা ডানায় বাতাস-কাটা কোণ অনেক বড় করে লিফ্‌ট্ রক্ষা করছে। এর কারণে নাক অনেক উঁচু থাকলে পাইলটের পক্ষে রানওয়ে দেখতে অসুবিধা হবে বলে নাকের অংশ ভেঙে নিচে নামিয়ে দেয়া হয়েছে।

কনকর্ডসহ সুপারসনিক বিমানের একটি বিপত্তি হল শব্দগতি অতিক্রমের সময় শকতরঙ্গ একটি বড় আওয়াজ সৃষ্টি করে বোমা ফাটার মতো। ওজনে হালকা বলে কনকর্ডে এটি কম হয়, তা ছাড়া এই ঘটনাটি লোকালয় থেকে দূরে উপরে অনেক উচ্চতায় গিয়ে ঘটানো হয়। তার পরও কনকর্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে ঊর্ধ্বাকাশের পরিবেশ বিনষ্ট করার। কনকর্ড শব্দের গতির দ্বিগুণ বেগে সাধারণত চলে থাকে—একে বলা হয় মাখ-২ গতি। অবশ্য সামরিক বিমানে মাখ-৫ বা তারও বেশি গতি অর্জন সম্ভব হয়েছে।

ভবিষ্যতে সুপারসনিক বিমানগুলো হয়তো কনকর্ডের পথপ্রদর্শনকেই অনুসরণ করবে। হয়তো এর বর্তমান সীমাবদ্ধতাগুলো সেক্ষেত্রে কিছু-কিছু অতিক্রম করা সম্ভব হবে—সেগুলো এত ছোট, এত আঁটসাঁট ও এত ব্যয়বহুল হবে না। দীর্ঘ সুপারসনিক যাত্রার ক্ষেত্রে পরিবেশের দিক থেকে যেসব ওজরআপত্তি রয়েছে তাও হয়তো নিরসন করা সম্ভব হবে। সেক্ষেত্রে আজকাল যেসব দূরত্ব অতিক্রম করতে দশ-বারো ঘণ্টার একটানা বিমানভ্রমণ করতে হচ্ছে, তখন সেটি তিন-চার ঘণ্টায় নেমে আসবে—ঢাকা থেকে লন্ডনে গিয়ে কাজ সেরে দিনে-দিনে ফিরে আসাও হয়তো সম্ভব হবে। শুধু তা-ই নয়, ডিজাইন চলছে আরো অধিক বেগের বিমানেরও যেগুলো হবে হাইপারসনিক—অনেকটা আজকের স্পেস শাটলের মতো গতিতে চলবে তবে বায়ুমণ্ডলের ভেতরে এবং জেট ইঞ্জিনের দ্বারাই। মহাকাশযানের অনেক বৈশিষ্ট্য নিয়েও সেটি পৃথিবীর যানবাহনেই ব্যবহৃত হবে।

আরো সুপরিসর বিমান

অনেকে আবার ভাবছেন অধিকাংশ বিমানযাত্রী খুব দ্রুত পৌঁছার চেয়েও আরাম করে

ঘুমিয়ে, বিশ্রাম নিয়ে, আলাপ বা পড়াশুনার কাজ করতে-করতে অথবা বিনোদন ও খেলাধুলা করতে-করতে প্রায় বর্তমানের গতিতেই যেতে চান। বিমানভ্রমণ এভাবে করতে পারার বড় বাধাটি হল যাত্রীর সংখ্যার তুলনায় বিমানের ভেতরে স্থানের অভাব। অনেক বেশি সুপরিসর বিমানের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সে-অসুবিধা দূর হবে। এতে অন্তত বেশকিছু যাত্রীর জন্য রীতিমতো বিছানা, আরামে বসে, কনফারেন্স করে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। আর বিনোদনের নানা ব্যবস্থা—এমনকি সুইমিংপুল পর্যন্ত থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। এয়ারবাস কোম্পানি শিগ্‌গির চালু করছে এমন বিমান—A3XX নামে। স্পষ্টত অধিক ওজন বহন করে লিফ্‌ট্ পাওয়ার মতো ইঞ্জিনশক্তির এবং ডিজাইনগত সমস্যাগুলোর সমাধান এজন্য ইতোমধ্যে হয়ে গেছে। বিভিন্ন বিমান কোম্পানির কাছ থেকে এর অনেক অর্ডারও এসেছে। ৬০০ যাত্রী বহন করতে পারবে এই বিমান। ক্যাবিনটি হবে পুরো দুইতলা—এর যাত্রীর বসার ব্যবস্থা করার জন্য। আকার ও ওজন অনেক বড় হলেও বর্তমানের এয়ারপোর্টগুলোতে একই রানওয়ে ব্যবহার করেই এটি উড়তে পারবে—অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যের প্রয়োজন হবে না। ল্যান্ডিং-এর সময় রানওয়ের উপর আঘাতটিও অসহনীয় কিছু হবে না।

আর একটু ভবিষ্যতের দিকে তাকালে হয়তো বিমানের ডিজাইনে আরো বৈপ্লবিক কিছু-কিছু পরিবর্তন আমরা দেখতে পাব। একটি সম্ভাবনা হল ফিউজল্যাজ ও ডানা একত্রিত হয়ে গিয়ে ত্রিভুজাকৃতি বিমান পুরোটাই একটি ডানায় পরিণত হওয়া যার স্ট্রিমলাইন দেহের ভেতরেই থাকবে যাত্রীর ও অন্যান্য স্থানের সংকুলান।

বিমান যত সুপরিসর হবে একে ততই বিলাসবহুল করা যাবে। এটি উচ্চবিত্ত যাত্রীদের জন্য সুখবর। তবে আবার এরকম সুপরিসর বিমানে অনেক বেশি যাত্রীর সংকুলানও হতে পারে যাতে সাত-আটশো এমনকি হাজার যাত্রী একই সঙ্গে ভ্রমণ করতে পারবে। এভাবে বিমানযাত্রার ব্যয় কমিয়ে আনা সম্ভব হবে—আরো বেশি মানুষ আরো ঘনঘন তখন বিমানভ্রমণের সুযোগ পাবে।

বিমানভ্রমণের জগতে গত ত্রিশ বছরে অভাবনীয় সব উন্নতি ঘটেছে, মানুষের এই ভ্রমণের পরিমাণ বেড়ে গেছে অনেক গুণে। আগামী ত্রিশ বছরে আরো দ্রুতহারে যে পরিবর্তন আসবে তা একেবারেই নিশ্চিত।

ISBN 984410362-2
9 789844 103627